পারুলদি

ও

অন্যান্য গল্প

গ্রন্থকারের বই-এর সম্পূর্ণ তালিকা :

কবিতা

শবরী, মৈনাক, শিবির, সোনার কপাট, রাজধানীর তন্দ্রা, একা

ছোটোগল্প

শ্মশানে বসন্ত, দ্বিতীয়া, কানামাছি, রেল-লাইন, পারুলদি

উপন্যাস

পূর্বরঙ্গ

ছোটোদের গল্প

ছায়ামূর্তি, ঘনশ্যামের ঘোড়া, ছাতুবাবুর ছাতা

ছোটোদের উপন্যাস

শ্বেতচক্র

অনুবাদ

এ্যাসপিনওয়ালের আলোকস্তম্ভরক্ষী (ছোটোদের উপন্যাস)
পরের দিন বড়দিন (ঐ, যন্ত্রস্থ)

পারুলদি

ও

অন্যান্য গল্প

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়,

বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

গল্পগুলি ১৯৪৫-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮-এর আগস্ট মাসের মধ্যে লেখা। ইতিপূর্বে প্রত্যেকটি গল্পই নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। —লেখক

পারুলদি

মনে-মনে ভয় ছিলো : শেষ মুহূর্তে রিজার্ভ করতে পারিনি, হয়তো সমস্তটা রাত বসে যেতে হবে। কলকাতা থেকে নাগপুর খুব কম পথ নয়। কাল বিকেল তিনটেয় পৌঁছবার কথা। এতোটা পথ কোনো রকমে বসে যাবার কল্পনা আশা করি কারুর কাছেই খুব সুখের নয়। অন্তত আমার কাছে তো নয়ই। অন্য কিছু সম্বন্ধে বিলাস না থাক, হাত-পা মেলে পরিষ্কার বিছানায় শোয়া এবং অন্তত ঘণ্টা সাতেকের পরিপূর্ণ ঘুমের বিলাস কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই দুরু-দুরু বুকে বি. এন. আর-এর বোম্বাই মেলের সেকেণ্ড ক্লাস কামরার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যখন দেখলুম যাত্রী মাত্র একজন তখন ভগবান থেকে আরম্ভ করে ভূতে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বললে হয়তো অত্যন্ত সহজেই রাজি হয়ে যেতুম।

নীচের একটি খালি বার্থে ভালো করে বিছানা পেতে সুস্থ হয়ে বসে আরাম করে সিগারেট ধরালুম। মনে-মনে নিজের এই আশাতীত সৌভাগ্যে এতো খুসি হয়ে উঠেছিলুম যে আমার সহযাত্রীকে ভালো করে দেখবার উৎসাহও বোধ করিনি। সিগারেট ধরিয়ে এবার ভিতরে-বাইরে ভালো করে লক্ষ্য করলুম। বাইরে বাংলা দেশের আশ্চর্য শরৎকাল। শাদা-শাদা টুকরো-টুকরো মেঘে যুক্তিহীন খুসির ইঙ্গিত, আকাশে সেই আশ্চর্য

নীল রঙ যা পৃথিবীর মধ্যে মাত্র একটি সময়ে শুধু এই বাংলা দেশেই দেখা যায়। রোদের রঙও কাঁচা সোনার মতো বিস্ময়কর। শরৎকালের এই আবহাওয়ায় নিজের দেশের সঙ্গে নতুন করে যেন প্রেমে পড়তে হয়, অথচ ঘরে মন টেঁকে না। কোথাও বেরিয়ে পড়ার দুর্নিবার আগ্রহ যেন পেয়ে বসে। রবীন্দ্রনাথ তাই বোধ হয় লিখেছিলেন প্রাচীনকালে এ-সময়ে রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। হায়, সেই প্রাচীনকালও নেই, সেই রাজারাই বা কোথায়? শুধু তাদের শারদীয় দিগ্বিজয়ের বাসনা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। আমি নেহাৎই একজন লাইফ ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানির ক্যানভাসার। আমার কোম্পানির নির্দেশে নাগপুরে চলেছি। দিন কয়েক সেখানে থাকতে হবে। দু লক্ষ টাকার জীবনবীমা করে দু মাসের মধ্যে আমাদের কোম্পানির এক মক্কেলের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর সঠিক বিবরণ জানবার জন্যে কোম্পানি আমাকে সেখানে পাঠাচ্ছে। আমার যাবার উদ্দেশ্য স্থানীয় লোকের কাছে ভালো করে খবর নেওয়া এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা। তাই, দিগ্বিজয়ের কথা উল্লেখ করলেও, আমার যাত্রার কারণ নেহাৎই চাকরি করা।

বাইরের মেঘ রোদ এবং আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে এবারে ভালো করে আমার সহযাত্রীর দিকে মনোযোগ দিলুম। প্রথম দৃষ্টিতেই খানিকটা হতাশ না হয়ে পারলুম না। ভদ্রলোকের শরীর এককালে যে অত্যন্ত মজবুত ছিলো এখনো তাঁর দিকে

চাইলে সে-কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁর চুলে পাক ধরেছে—জুলপির এবং কানের উপরকার চুলগুলি রীতিমতো শাদা হয়ে এসেছে। অনুমানে তাঁর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন-র কম বলে কিছুতেই মনে হয় না। এ-বয়সে মানুষ হয়তো দ্বিতীয় পক্ষের পর তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করতে কিংবা নেহাৎ নাবালিকা কিশোরীর সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারে—কিন্তু জীবনবীমা করে না। ভদ্রলোককে দেখে আমার হতাশার এইটিই প্রধান কারণ। এঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করার প্রয়োজন আমার নেই। যখন একই কামরায় চলেছি এবং ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত কোনো তৃতীয় যাত্রীর আবির্ভাব আর হয়নি—তখন আলাপ না হয়ে আর উপায় কী? আলাপ হবেই। অনর্থক আগে থেকে আমি কেন উৎসাহ দেখাই? যেখানে মানুষকে গোড়া থেকেই বোঝা যায় কোনো কাজে লাগবে না বলে, সেখানে গায়ে পড়ে আলাপ করার চেয়ে কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাস খুলে বসা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আমার ছোটো ব্যাগটার ভিতর থেকে কয়েকটি বই বার করে বিছানায় রাখলুম।

বইগুলির বিবরণ শুনলে অনেকেই হয়তো কিছুটা বিস্মিত হবেন। ডিটেকটিভ বই ছাড়াও টাইম-টেবিল, আমাদের কোম্পানির পরিপূর্ণ-তথ্য এবং গত বছরের হিসেব-নিকেশ সম্বলিত পুস্তিকা ছাড়াও আরো একটি বই ছিলো। সে-বইটি যে কী এ-বিষয়ে আপনাদের অনুমান করতে বললে নেহাৎই সময়ের

অপব্যয় হবে, তাই ও-ভাবে সময় নষ্ট না করে গোড়াতেই বলে রাখি বইটি কবিতার। নতুন বেরিয়েছে। যাঁরা কবিতা বোঝেন সে-রকম দু-চারজন সমজদার বন্ধুর কাছে বইটি নিয়ে তাঁদের মতামত আমি জানতে চেয়েছিলুম। আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি কাব্য সম্বন্ধে সমজদারদের মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুর মত বড় একটা মেলে না। ওমুকের লেখা এ যদি বলে ভালো ও নিশ্চয়ই বলবে বোগাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই নতুন কাব্যগ্রন্থ 'জোনাকি' সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে এতোটুকু মতবিরোধ হয়নি। তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছেন এ-রকম ট্র্যাশ বই হালে কয়েক বছরের মধ্যে বেরোয়নি।

আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন প্রথমে যে-বইটি আমি তুলে নিলুম এবং মন দিয়ে পড়তে লাগলুম সেটি অন্য কিছু নয়—'জোনাকি'। কিন্তু এর কারণ শুনলে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হবেন না। 'জোনাকির' লেখক অমিয়াংশু সেনগুপ্ত। তিনি নাগপুরে থাকেন। বয়সে তরুণ এবং সবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অতুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। নাগপুরের এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়েছি এঁকে তেমন ভাবে ধরতে পারলে বেশ মোটা অঙ্কের জীবন বীমা করানো খুব অসম্ভব কিছু নয় এবং যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের ধরার সবচেয়ে ভালো উপায় যে কবিতা সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁদের রচনা সম্বন্ধে, আলোচনা করা এবং আভাসে-ইঙ্গিতে প্রশংসা করা এ-কথা

জানতে যাঁদের দেরি হয় তাঁদের দিয়ে আর যাই হোক জীবন বীমার দালালি করানো সম্ভব নয়। এমন কোনো মহিলার কথা আমি জানিনা যাঁকে দেখতে ভালো বললে তিনি খুসি না হয়ে পারেন। এমন কোনো লেখকও আমার অজানা যাঁকে তাঁর রচনা সম্বন্ধে প্রশংসা করলে তিনি বিচলিত না হন। এ-ক্ষেত্রে মহিলার আসল সৌন্দর্য কিংবা রচনার সত্যিকারের উৎকর্ষ নেহাৎই অবান্তর।

"কী বই পড়ছেন মশাই? কবিতার?"

নিতান্ত অপরিচিতের কাছ থেকে প্রথম সম্ভাষণ এ ভাবে এলে আশ্চর্য হবারই কথা। মনে-মনে বিরক্ত হওয়াও চলে। তাই আমি বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে উত্তর দিলুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমার সহযাত্রী একটুও দমলেন না। বরঞ্চ যেন উৎসাহিত হয়েই আবার প্রশ্ন করলেন, "কিসের? প্রেমের?"

বললুম,"যদি তাই হয় তা হলে কি আপনার আপত্তি আছে?"

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে বললেন, "তা হলে চটেই গেলেন দেখছি! আপনি কি লেখেন-টেখেন নাকি? কবিতা-টবিতা?"

প্রথমটায় বিরক্ত হলেও ভদ্রলোকের কথার ধরণ দেখে আর রাগ রইল না। বয়স হলেও তাঁর মনটি যে যথেষ্ট সরস আছে তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্ত আগেকার রুক্ষতা

চাপা দেবার জন্যে হেসে বললুম, "না মশাই, এতোক্ষণ বাস্তবিক রাগ করিনি। কিন্তু আমাকে কবি বলে ভুল করলে এবার সত্যিই দারুণ চটবো।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আপনি কবি না হতে পারেন কিন্তু রসিক ব্যক্তি যে তাতে এতোটুকু সন্দেহ নেই। আপনার কথার বাঁধুনি দেখেই বুঝেছি।—কিন্তু আমি বলছিলুম কি—" বলতে-বলতে তিনি বার্থ ছেড়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপরকার বাঙ্ক থেকে পেট-মোটা অদ্ভুত গড়নের বেশ বড় একটি ফ্লাস্ক নামিয়ে বললেন, "বলছিলুম যে বিদেশে থেকে একটু-একটু পান করা আমার অনেক বছরের অভ্যেস। যদি মনে কিছু না করেন তা হলে আমার সঙ্গে যোগ দিলে বাধিত হব। এর মধ্যে বাজে জিনিস নেই—আসল 'শাদা ঘোড়া' ভরে রেখেছি, বরফ এবং সোডার জল মেশানো।"

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে জানালুম রসের ঐ মার্গে এখনো পৌছতে পারিনি। অতএব কোনো রকম কুণ্ঠিত না হয়ে ঐ 'শাদা ঘোড়া'র সওয়ার তিনি একলাই হন, আমি কিছু মনে করবো না।

তিনি একটু যেন ক্ষুণ্ণই হলেন। কিন্তু আমাকে দলে টানবার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই দেখে কাঁচের গেলাসে হুইস্কি ঢেলে একলাই সুরু করলেন। আমি আবার 'জোনাকি'-তে মনোযোগ দিলুম।

'জোনাকি'র শেষের ক'টা পাতা আর পড়তে পারলুম না। বাইরের আলো আবছা হয়ে এসেছে। সে-আলোয় ভালো করে অক্ষর চেনা যায় না। বইটা বন্ধ করে আমার সহযাত্রীর দিকে চেয়ে বুঝতে দেরি হোলো না এই সময়টুকুর মধ্যেই তিনি ফ্লাস্কটা প্রায় শেষ করে এনেছেন। সন্ধ্যার পাণ্ডুর আলোয় তাঁর সমস্ত মুখ যেন থম-থম করছে।

আমার পড়া শেষ হবার জন্যে তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে মুখ তুলতে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "শেষ হোলো ?"

ভদ্রলোকের গলার স্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে, চোখের চাউনি, মুখের ভঙ্গীও এখন অন্য রকম। একটু অস্বস্তিই লাগছিলো। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উঠে আলো জ্বালাবার জন্যে স্যুইচের দিকে হাত তুলতে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, "দরকার না থাকলে আলোটা না-ই জ্বালালেন। আজ প্রতিপদ। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।"

ফিরে এসে নিজের বার্থে আবার বসলুম। মাতাল সহযাত্রী না থাকলে আলো না জ্বালিয়েই বাইরের দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকতে হয়তো ভালোই লাগতো।

ভদ্রলোক সোনার সিগারেট কেস থেকে একটি দামী সিগারেট ধরিয়ে উঠে এসে আমার বার্থে বসলেন এবং আমার দিকে সিগারেট কেসটি এগিয়ে দিলেন। আমিও সিগারেট ধরালুম।

"ছাব্বিশ বছর পরে এবার কলকাতায় এসেছিলুম", কোনো রকম ভূমিকা না করেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "কিন্তু ছাব্বিশটি দিনও কলকাতায় থাকিনি। পরশু এসেছি, আজ ফিরে চলেছি।"

খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথা বললেন না তারপর অকস্মাৎ বললেন, "এই দু-দিনে আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। কাউকে যতক্ষণ না সমস্তটা বলতে পারছি ততক্ষণ সুস্থ হবো না। মাতালের প্রলাপ বলে মনে করবেন না মশাই। বিশ্বাস করুন, একটি বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। অবশ্য বিশ্বাস করা একটু শক্ত হবে বৈকি। তাই ফ্লাস্কটা আপনার দিকে তখন এগিয়ে দিয়েছিলুম। কয়েক চুমুক দিলে দেখতেন বিশ্বাস করা কঠিন হোতো না।"

আমি আশা করেছিলুম শেষের কথাটি বলে তিনি হাসবেন। কিন্তু তাঁর সেই থমথমে মুখের চেহারার এতোটুকু পরিবর্তন হোলো না। বরঞ্চ মনে হোলো তিনি যেন আরো একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

তারপর ভদ্রলোক যে-আশ্চর্য ঘটনার কথা বললেন এখানে সে-কথাই লিখছি। তিনি যে-ভাবে গুছিয়ে বলেছিলেন ঠিক সে-ভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম :

আমার নাম বিজয়রতন মজুমদার। বেলেতোড় গ্রামে জন্ম।

আমরা খুব গরীব ছিলুম। বিষয়সম্পত্তি বলতে গেলে কিছুই ছিলো না। আমার যখন বারো বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। মা ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বড়লোক তিনি কলকাতায় থাকতেন। কি জানি কেন আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেবার পূজোর সময় দেশে এসে আমার বিপদের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ফেরার সময় দয়া করে আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি তাঁদের বাড়িতেই ছিলুম।

ভদ্রলোকের সংসার খুব ছোটো। তিনি এবং তাঁর ছেলে। বহুকাল থেকেই তিনি বিপত্নীক। তাঁর ছেলে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। মনে আছে আমি যে-বছর কলকাতায় এলুম তাঁর ছেলে, নীরেনদা, সে-বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

নীরেনদার বাবা আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বাড়ির সবাই আমাকে ভালোবাসতো, শুধু, কি জানি কেন, নীরেনদা আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। মুখে অবশ্য সে কিছু বলতো না, কিন্তু তার ব্যবহার থেকে এটুকু বুঝতে আমার দেরি হয়নি। তাদের মস্ত কম্পাউণ্ডওলা তিনতলা বাড়ি। আমি গ্যারেজের পাশে ছোটো ঘরটায় থাকতুম। নীরেনদা থাকতো তিনতলার উপরের সবচেয়ে ভালো ঘরটায়। নীরেনদা যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো ততক্ষণ

আমি সযত্নে তাকে এড়িয়ে যেতুম। নীরেনদা বেরুলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। সমস্ত বাড়িময় তখন আমার অবাধ গতি।

নীরেনদার বাবার নাম শিবনাথবাবু। তিনি শেয়ার বাজারে স্পেকুলেট করতেন। লোকে বলতো তাঁর মতো ভাগ্যবান পুরুষ আর নেই। লোকে বলতো তিনি নাকি ধূলি মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়ে যায়। তখনকার দিনে খুব বড়লোক না হলে কেউ মোটর কিনতে পারতো না। শিবনাথবাবুর ছুটো মোটর গাড়ি ছিলো। একটি নিজের, অন্যটি নীরেনদার।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করলুম, নীরেনদা সেবার বি. এ. পাশ করে শিবনাথবাবুর সঙ্গে তাঁর আপিসে যেতে সুরু করলো। শিবনাথবাবু প্রায়ই বলতেন এতো বড় বাড়িতে গৃহিণী না থাকলে মানায় না। তাই নীরেনদার বি. এ. পাসের পরেই তিনি খুব ঘটা করে তার বিয়ে দিলেন। ও-রকম জাঁকজমকের বিয়ে আমি তো আর কখনো দেখিনি।

নীরেনদার বউকে আমি পারুলদি বলে ডাকতুম। পারুলদি আমার চেয়ে এক বছরের ছোটো ছিলো। মনে আছে নতুন বউ পারুলদি যখন আমাদের বাড়িতে এলো তখন তার পনেরো বছর বয়স, আমার তখন ঠিক ষোলো। ইস্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছি।

পারুলদির মতো অত রূপ আমি আর কারুর দেখিনি। তার রঙ হাতির দাঁতের মতো। ছিপছিপে চেহারা। হাতের চেটো

দুটি এতো গোলাপি যে দেখলে ভয় হোতো এখনি বুঝি ফেটে রক্ত পড়বে। পারুলদি হাসলে তার গভীর কালো চোখ দুটিও যেন আরো বড় হয়ে হেসে উঠতো আর তার দু-গালে দুটি টোল পড়তো। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ছিলো পারুলদির চুল। তার চুলের রঙ কালো নয়, সামান্য কটা। পারুলদি চুলে তেল দিতে ভালোবাসতো না। প্রায়ই দেখতুম মাথা ঘষে পিঠের উপর তার সেই রেশমের মতো চুল সে এলিয়ে দিতো। তার কপালের ছোটো লাল টিপ থেকে তার পায়ের আঙুলগুলিকে পর্যন্ত আমি ভালোবেসে ফেলেছিলুম। এখনো মনে আছে আমার সেই গ্যারেজের পাশের ছোটো ঘরে পারুলদি হঠাৎ যে-দিন প্রথম এসেছিলো সেই ছোটো ঘরটা যেন সত্যিকারের আলো হয়ে গিয়েছিলো। আর আমার এতো ভালো লেগেছিলো আর ভয় হয়েছিলো যে ভালো করে চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত আমি পারিনি।

নীরেনদা আমাকে যে-রকম দেখতে পারতো না পারুলদি আমাকে আবার ঠিক সেই রকমই ভালোবাসতো। দু-দিনেই পারুলদি বুঝে গিয়েছিলো আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা নীরেনদা পছন্দ করে না। তাই শিবনাথবাবু আর নীরেনদা আপিসে বেরিয়ে যাবার পরে পারুলদি আমায় ডেকে পাঠাতো। কতদিন যে কলেজ কামাই করে পারুলদির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি তার হিসেব নেই।

শিবনাথবাবুর একমাত্র ছেলের বউ। অতএব পারুলদির যে কী দারুণ আদর-যত্ন ছিলো তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। বড়লোকের বৌ, বড়লোকের মেয়ে—কখনো কোনো জিনিসের অভাব তার হয়নি। চাইতেই সবকিছু সে বরাবর পেয়েছে, না-চাইতেও পেয়েছে। পারুলদিকে দেখতে যেমন সুন্দর ছিলো, সে-রকম সাজতেও সে ভালোবাসতো খুব। দিনের মধ্যে কতবার যে সে শাড়ি বদল করতো, কত রকমের কত গয়না সে যে পরতো তার ফর্দ দিতে গেলে এ-গল্প আর বলা হয় না।

ভারি সুখী ছিলো পারুলদি। সকালে ঘুম থেকে উঠতে-উঠতেই তার ন-টা বেজে যেতো। তার ঝি যে কতবার চা করে নিয়ে যেতো আর কতবার যে অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা চা নিয়ে ফিরে আসতো তার হিসেব নেই। ঘুম ভাঙিয়ে তাকে চা দেবার নিয়ম ছিলো না, অথচ ঘুম ভাঙবার পরেই বিছানায় চা না পেলে তার ভারি কষ্ট হোতো। তাই ঐ ব্যবস্থা।

নীরেনদার বিয়ের পর প্রথম পাঁচটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো তার হিসেব এখনো আমি পাই না। এখনো সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে মনে হয়: এই তো সে-দিন! হাত দিয়ে বুঝি ছোঁয়া যায় তাদের।

সেই পাঁচটা বছর যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে। পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে যেন স্বপ্ন দেখেছি।

পাঁচ বছর পরে হঠাৎ একদিন আমার যেন চমক ভাঙলো।

সেদিন দুপুরে কলেজ যাবার জন্যে আমি তখন বেরুচ্ছি পারুলদি তার ঘরে আমায় ডেকে পাঠালো। ঘরে ঢুকে আমি চমকে উঠলুম। একদিনে একটা মানুষের চেহারা এতো খারাপ হয়ে যেতে দেখিনি : পারুলদির চোখের তলায় কালি পড়েছে, মুখের সেই হাসি আর নেই। আমাকে কিছু আর বলতে হোলো না। পারুলদি বললো, "বিজু একটা মজা দেখবি?" বলে আমাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই আমার দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিলো। দেখলুম সেই হাতির দাঁতের মতো রঙের উপর অনেকগুলো লম্বা-লম্বা নীল কালসিটের দাগ। তারপর পারুলদি আমার দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসতে লাগলো। তারপর খুব সহজে বললো, "তোর নীরেনদা কাল রাতে মদ খেয়ে এসে আমাকে মেরেছে। কেন মেরেছে জানিস? তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নাকি"—পারুলদি আর কোনো কথা বলতে পারলো না। বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো।

আমি তখন এম. এ. পড়ি। পরের বছর পরীক্ষা। কিন্তু কোথায় কী? আমার পায়ের নীচে তখন সমস্ত পৃথিবী কাঁপছে, আমার মাথার উপরে আকাশ ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি আর আমার ঘরেও ফিরে গেলুম না। আমার বই-জামা-কাপড় যেমন ছিলো তেমনি রইলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়ার ইস্টিশানে।

ছাব্বিশ বছর আগে সেই আমি কলকাতা ছেড়েছি। আর ফিরিনি।

প্রথম পাঁচ-ছবছর নানা কাজ করেছি। কখনো দু-বেলা খেতে পেয়েছি, কখনো পাইনি। তারপর আসতে-আসতে সি.পি. তে কাঠের ব্যবসা সুরু করি। এখন কারবার বেশ ভালো। ও-দেশেই বিয়ে করেছি। আমার ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে। নিজের সংসার, নিজের ব্যবসা—বেশ আছি। কিন্তু আমার কথা থাক।

কলকাতা ছাড়ার বছর দুয়েক পরে খবরের কাগজে একদিন শিবনাথবাবুর মৃত্যুসংবাদ পড়লুম। থ্রম্বসিস্ হয়ে হঠাৎ তিনি মারা গেছেন। তারপর থেকে নীরেনদা বা পারুলদির আর কোনো খবর পাইনি।

হঠাৎ ছাব্বিশ বছর পরে পারুলদির চিঠি পেয়ে কলকাতায় এলুম। পারুলদি লিখেছে খুব ছোট্ট চিঠি, "বিজু, মরবার আগে তোমাকে একবার দেখতে চাই। একবার এসো। তোমার পারুলদি।"

চিঠি পেয়ে যে কী রকম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম সে-কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আরো আশ্চর্য হলুম চিঠির ঠিকানা দেখে। এ-তো পারুলদিদের বাড়ির ঠিকানা নয়। তারা থাকতো রডন ষ্ট্রীটে, ঠিকানা রয়েছে রমেশ মিত্তির রোডের।

চিঠি পেয়েই পরশু আমি কলকাতায় এসে পৌঁছই। পরশু সন্ধের দিকে রমেশ মিত্তির রোডে বাড়ি খুঁজছি, কিন্তু কিছুতেই

নম্বরটা পাচ্ছি না। সামনের বাড়ির রকে দেখলুম একটি ঝি বসে রয়েছে। ভাবলুম তাকে একবার জিগগেস করি। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করার আগেই দেখলুম সে আমার দিকে চাইলো। ময়লা থান কাপড়, মাথার চুল ছোটো-ছোটো করে ছাঁটা, অধিকাংশই পেকে গেছে, খালি পা'য়ে হাজা হয়েছে, গায়ে জামা নেই। শুধু পারুলদির চোখ দুটোর মধ্যে কী যেন বদলায়নি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুদূরের গ্যাসের আলোটা জ্বলছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।—পারুলদি! এই কি পারুলদি?

তারপর পারুলদির পাশে সেই ময়লা রকের উপরেই বসে পড়লুম। পারুলদি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো। বারবার বলতে লাগলো, "বিজু তুই এলি! তুই এলি! আমার সব গেছেরে, গাড়ি গেছে, বাড়ি গেছে, স্বামী গেছে—একটা ছেলে ছিলো লড়াইয়ের চাকরি নিয়ে সে-ও গেছে, আর ফেরেনি, কোনো খবরও জানি না। ঐ সামনের বাড়িতে আমি ঝি হয়ে আছি। দু-বেলা খেতে দেয়, সাত টাকা মাইনে।"

আমি কী বলবো? বুকের মধ্যে এমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিলো যে ভালো করে নিশ্বেস নিতে পর্যন্ত পারছিলুম না।—পারুলদি! এই কি আমার পারুলদি?

বেশি দেরী হলে গিন্নীর কাছে গালাগালি খেতে হবে বলে পারুলদি বেশিক্ষণ বসতে পারলো না। আমি বললুম কাল

আবার আসবো। বললুম পারুলদি যেন প্রস্তুত থাকে। আমি কাল তাকে নিয়ে যাবো।

গতকাল বিকেলে রমেশ মিত্তির রোডে আবার গেলুম। যেখানে পারুলদির থাকবার কথা, দেখি সেখানে কেউ নেই। যে-বাড়িতে সে কাজ করে দেখিয়েছিলো সে-বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লুম। বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন। বললুম, "এখানে পারুল বলে কেউ কাজ করে ?"

কর্তা আমার দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে বললেন, "করে না, করতো। দিন পাঁচেক আগে লরিতে চাপা পড়ে মারা গেছে। হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো— তার যে কোনো আত্মীয় আছে সে-কথা আমরা জানতুম না। আপনি তাঁর—"

এই পর্যন্ত বলে বিজয়বাবু থামলেন। তারপর নিজের বার্থে গিয়ে বসে হুইস্কির ফ্লাস্কটা বার করে বাকীটা ঢকঢক করে গিলে ফেললেন। বাইরে ধবধবে জ্যোৎস্না উঠেছে। আমি বসে-বসে শুধু ভাবতে লাগলুম কামরার আলোটা জ্বালাবো—না জ্বালাবো না।

পিঁপড়ে

এক ফোঁটা চায়ের ভিতর কতটুকু চিনিই বা থাকে?

কিন্তু সেই চিনিটুকুর লোভেই কয়েকটা ক্ষুদে-ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে এসে জমা হয়েছে। তখনো ভালো করে সকালের আলো স্পষ্ট হয়নি। ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়। বাইরের ঘরের সামনেই একটি তেঁতুল গাছ। ইতিমধ্যে কচিকচি সরুসরু নতুন পাতায় সমস্ত গাছটা ছেয়ে গেছে। সেই গাছের ভিতর দিয়ে এই অস্পষ্ট আলো চুঁইয়ে বাইরের ঘরের ভিতর আসছে বলে সমস্ত ঘরটায় একটা আবছা-সবুজ ছায়া। ভালো করে চোখ খুলে চাইলে সেই সবুজ রঙ ধরা পড়ে না। কিন্তু চোখের দৃষ্টিকে ঢিলে করে দিলে সেই সবুজ রঙটা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

চা খাওয়া শেষ করে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই বীণা চেয়ারে বসেছিলো বলে আজ সকালের এই অস্পষ্ট সবুজ আভা সে অনুভব করেছে। অনেকক্ষণ চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পেয়ালাটাও নেই, চাকরে নিয়ে গেছে। শুধু নিয়ে যাবার সময় অসাবধান হাতে একফোঁটা চা মেঝের উপর গেছে ফেলে। সেই চায়ের ফোঁটার উপরেই ক্ষুদে-ক্ষুদে লাল পিঁপড়েগুলো এসে জমেছে। অন্যমনস্ক চোখে বীণা মেঝের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবছিলো। কোনো বিশেষ একটি চিন্তা যে তার মনের মধ্যে

ছিলো তা নয়। সমস্ত রাত জেগে থাকার পর সকালে বসে-বসে বিশেষ ধরনের কোনো ভাবনা ভাবা যায় না। তাই সে শুধুই চেয়েছিলো আর পিঁপড়েগুলোকে লক্ষ্য করছিলো।

এমনিতে দেখাই যায় না—কিন্তু কোথাও একফোঁটা মিষ্টির গন্ধ পেলেই এই পিঁপড়েগুলো যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে। অমিয়ও প্রথম যেন মাটি ফুঁড়েই এসেছিলো আর নিজে তো তখন সে একফোঁটা মেয়ে। কলেজে সবে তখন গ্রীষ্মকালের ছুটি হয়েছে। কলকাতা থেকে তার দাদা ফিরলো। সঙ্গে নিয়ে এলো অমিয়কে। প্রায় মাটি ফুঁড়ে উঠে আসারই মতো। তার আগে পৃথিবীতে কোথাও যে একটি আধ-ময়লা রোগা ছেলে আছে, যার চোখে মস্ত বড় পুরু কালো ফ্রেমের চশমা, পায়ে ছেঁড়া চটি, পরনে মোটা খয়েরি-পাড় ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর এতো নাম থাকতে যার নাম অমিয়—সে-কথা বীণা তো জানতোই না, তার মা-বাবাও না। তার দাদা ঐ এক ধাঁচের মানুষ। কলেজের ছুটিতে একলা কখনো সে আসেনি, সঙ্গে বরাবরই একটি না একটি সহপাঠীকে নিয়ে এসেছে। এর আগে কত ছেলেই তো এসেছে—তাদের গ্রামে কয়েকদিন খুব হৈ-হল্লা করেছে, গাছে চড়েছে, পুকুরে সাঁতার কেটেছে, গানটানও গেয়েছে। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার বড় একটা কেউ তারা আসেনি। অমিয় কিন্তু অন্য জাতের। হৈ-চৈ তো বড় একটা সে করেই না, এমন কি কথাও যখন বলে তখন প্রায় বোঝাই

যায় না এ-রকম মৃদু গলায়। বাইরের ঘরে তার দাদা আর অমিয়র জন্যে চা নিয়ে বীণা যখন এলো সে কি তখন ভাবতে পেরেছিলো এই খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পুরু চশমা-পরা ছেলেটা আবার তাদের বাড়িতে আসবে? শুধু দ্বিতীয়বার আসা নয়, বারবার আসবে? কলেজের প্রত্যেক ছুটিতে, তার দাদার সঙ্গে?

সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরের বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে নিতান্ত নির্বিকার ভাবে অমিয় সিগারেট টানছিলো। আজ এই ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিজের স্বামীর বাড়িতে বসে ছোটো-ছোটো লাল পিঁপড়েগুলির দিকে চেয়ে অমিয়র সেই নির্বিকার ভঙ্গীটি ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিছু না-ভেবেই সেই একফোঁটা মেয়ে বীণা পা টিপেটিপে অমিয়কে সে-রাতে দেখতে এসেছিলো। কেন এসেছিলো এই প্রশ্ন নিজেকে অনেকবার নিজে সে করেছে। কিন্তু উত্তর পায়নি। কেন যে সে-রাতে সেই চুরি করে দেখতে আসার সময় তার বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করেছিলো সে-কথাই বা কে বলবে? বেশিক্ষণ বীণা দাঁড়ায়নি। রান্নাঘরে মা-র কাছে ফিরে উনুনে দুটো কাঁঠাল-বীজ গুঁজে দিয়েছিলো। অত রাতে হঠাৎ তার কাঁঠাল-বীজ পোড়া খাবার সখ অবশ্যই হয়নি। তার দাদা যে বলেছিলো অমিয় ছেলে ভালো, পরীক্ষায় মেডেল পায়, নিজের বাড়িতে থাকে না, ঝগড়া করে কোন একটা মেসে এসে

থাকে—এই সব কথাগুলো শোনবারই একটা অন্যায় রকম লোভ তার হয়েছিলো। লোভ কেন হয় কে বলবে? আজ সকালে তেঁতুল-গাছের পাতা ঘরের আলোকে কেন যে আবছা-সবুজ রঙ করেছে সে-কথাটাই বা বলবে কে?

বীণার স্বামী বোধ হয় টেরই পায়নি এতো ভোরে বীণা তার পাশ থেকে উঠে বাইরের ঘরে বসে একা-একা এই সব মাথামুণ্ডু ভাবছে। আর অমিয়?—নাঃ, সে-কথা জোর করে মন থেকে তাড়াতে বীণা চেষ্টা করলো। পরের মুহূর্তেই সেই একফোঁটা চা আর লাল পিঁপড়েগুলোর দিকে চোখ রেখে মনে-মনে সে ঠিক করে ফেললো তেঁতুল গাছের ও-পাশের পুকুরে ডুবে সে মরবে। পুকুরের তলায় সবুজ আর নরম শ্যাওলার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমুতে তার কেমন লাগবে কে জানে!

অমিয় কথা বলতো কম, হাসতো অল্প, ভাবতো অনেক। আর কী সব ছাই-পাঁশ মাথামুণ্ডুহীন সেই সব ভাবনা। নইলে সেই পাঁচ বছর আগে মাঠের ভিতরকার আলোর উপর দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ কিনা সে বলে বসে রেল লাইন ধরে তাকে নিয়ে চলে যাবে, আর ফিরবে না! তার ভাবনাগুলোই ছিলো ঐ রকম খাপছাড়া, বেয়াড়া। রেল-লাইন ধরে চলে গেলেই তো হয় না! তারপর কোথাও একটা থামতে হয়, দরকার হয় বাড়ির, খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, টাকা-কড়ির। সেই মেডেল-পাওয়া আর অত লেখাপড়া-জানা ছেলেটার সেদিকে

কোনো হুঁস নেই দেখে বীণা যতটা আশ্চর্য হয়েছিলো বিরক্ত হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি! বীণার কী দায় পড়েছে সমস্ত জীবন অমিয়র সঙ্গে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে, তার চেয়ে পাটের কারবারী জীবনের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ হওয়া অনেক আরামের। জীবনের মাথার মাঝখানে চুল নেই এবং সামনের দিকের একটা দাঁতও পড়ে গেছে এ-কথাটা সত্যি বটে—কিন্তু টাকা? তার নাকি এতো টাকা আছে যা দিয়ে বীণার বাবার কাঁঠাল কাঠের বড় সিন্দুকটার মতো দশটা সিন্দুক ভরে ফেলা যায়! গ্রামে তার প্রতিপত্তি আছে, পেটের উপর ছোট্ট একটি ভুঁড়ি আছে—তাছাড়া প্রথম পক্ষের ছেলেটাকেও চিরকালের মতো মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছেও যে আছে সে-কথাও তো নাপতিনিকে দিয়ে বীণাকে সে চুপিচুপি বলে পাঠিয়েছিলো! —কী আশ্চর্য, আজ সকালে ঐ পিঁপড়েগুলোর দিকে চাইতে-চাইতে এই সব তুচ্ছ কথাগুলো কেমন স্পষ্ট তার মনে পড়ে যাচ্ছে!

জীবনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে সবাইকারই দারুণ মত ছিলো, এমন কি তাদের বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্যন্ত। অমিয়র পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে, পূজোর ছুটি কিংবা গ্রীষ্মের ছুটি বলে তখন তার কিছু নেই—সব সময়েই ছুটি। অমিয় ঐ বিয়ের কথা শুনে বিশ্বাসই করেনি! তার মুখ-চোখের চেহারা দেখে বীণার ভারি মজা লেগেছিলো। এতো মজা খুব কম মানুষেরই লাগে। চাঁচ-

দিয়ে-ঘেরা জলের ঘরে গিয়ে মুখে আঁচল দিয়ে সে কী হাসিটাই না হেসেছিলো ঐ লেখাপড়া-জানা বোকা ছেলেটার মুখের চেহারার কথা ভেবে! তবু অমিয়র সঙ্গে সেদিন সন্ধেবেলায় পাশের গ্রামের যাত্রা দেখতে যেতে সে মোটেই আপত্তি করেনি। আর যাবার সময় সেই অন্ধকার জোনাকী-জ্বলা তারা-চিকচিকে আকাশের তলায় অমিয় যখন তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলো আর বলেছিলো তার সঙ্গে পালিয়ে যাবার সেই পুরনো প্রস্তাবের কথা তখন সে কি শুধু খানিকটা মজা করবার জন্যেই সম্মতি জানিয়েছিলো? আর অমিয়টাও কি এতোই বোকা যে বিশ্বাস করেছিলো বীণাকে? জীবনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর অনেক রাতে যখন তার কিছুতেই ঘুম আসেনি অথচ জীবন অসাড়ে ঘুমুচ্ছে তখন কতবার উঠে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খানিক খেয়ে খানিক ঘাড়ে আর কানের ডগায় ছিটিয়ে সে ঠাণ্ডা হতে চেষ্টা করেছে, বিছানায় ফিরে এসে চেষ্টা করেছে ঘুমুতে—আর ঘুম না আসায় ঐ-সব প্রশ্ন-গুলোই নিজের মনে বারবার নাড়াচাড়া করেছে বীণা। তার জন্যে অমিয় কি অপেক্ষা করেছিলো ইস্টিশানের কাছের সেই বুড়ো বট-গাছটার তলায়, আর ট্রেন এসে ট্রেনটা চলে যাবার পরে কি অমিয় তার জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলো? অমিয়র চোখে কখনো সে জল দেখেনি—তার ভারি ইচ্ছে ছিলো অমিয়র চোখে দু ফোঁটা জল দেখার। সেই মোটা ফ্রেমের চশমার পিছনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে—গড়িয়ে পড়ছে তারই

জন্যে—এই চিন্তা কতবার তার মনে রোমাঞ্চ এনেছে। বীণা যে সাধারণ নয়, আর সবাইকার চেয়ে যে তার দাম অনেক বেশী এই কল্পনাটাই বা মন্দ কি? নইলে সিন্দুক বোঝাই যার টাকা সে কিনা সেই নাপতিনিটাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে বারবার তার কাছে পাঠায়—আর লেখাপড়া করে যে সোনার মেডেল পায় সে কি না তার জন্যে প্রায় পাগলামী সুরু করে?

তার বিয়ে হয়ে যাবার পর দাদার কাছে যখন সে শুনলো অমিয় হঠাৎ অনেক দূর দেশে একটা নেহাত বাজে কেরানিগিরির চাকরি নিয়ে চলে গেছে তখন অমিয়র জন্যে তার দুঃখ বিশেষ কিছুই হয়নি—বরঞ্চ ভালোই লেগেছিলো! ভাবতে ভালো লেগে-ছিলো অনেক দূর দেশে এমন একটি লোক আছে যে শুধু তার কথাই ভাবে।

অমিয় যে গিয়েছিলো সে আজ ক'বছর আগেকার কথা? মনে-মনে বীণা হিসাব করলো: ছ'বছর হবে বৈকি। বাইরে গিয়ে মাঝে-মাঝে বীণার দাদাকে সে চিঠি লিখতো। তার দাদার মুখেই বীণা খবর পেতো সেই চিঠির কথা। ভালোই লাগতো খবর পেতে। শুধু একটি জিনিস তার ভালো লাগতো না। সেটি হচ্ছে বীণা সম্বন্ধে অমিয়র নির্বিকার ভাব। যে ছেলেটা এখানে থাকার সময় বীণাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতো না দূর দেশে গিয়ে বীণার কথা বাদ দিয়ে কেমন করে সে চিঠি লিখতে পারে? এ কি অভিমান? না রাগ? যা-ই হোক—এই কথা ভেবে বীণা খুসি

হয়েছে যে অমিয় জোর করেই তার কোনো কথা লেখেনি। তার মানে আর কিছুই নয়—বীণা তার মনের ভিতর ঠিক সেই রকমই আছে। তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সহজ নাকি? রেলগাড়িতে চেপে হাজার মাইল দূরে চলে গেলেই বুঝি বীণাকে ভোলা যায়? বীণা আর সেই ছোটো একফোঁটা মেয়ে নেই, এখন সে অনেক বড় হয়ে গেছে। সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে।

অমিয় চলে যাবার পরের বছর বীণার একটি মেয়ে হোলো, জীবনের আরো কটা দাঁত পড়ে গেলো, ব্যবসাতে টাকা এলো অনেক। খুসি হয়ে জীবন বীণার কোমরে একটি সোনার বিছে গড়িয়ে দিলো। তখন কোমরটা তার বেশ সরুই। বিছে গড়তে তেত্রিশ ভরি সোনা লেগেছিলো সত্যি, কিন্তু আর একটু মোটা হয়ে উঠতে পারলে যে পঞ্চাশ ভরিতে দাঁড়াতো সে-কথাটা বীণা ভুলতে পারলো না। তার লোকসান হোলো বৈকি!

পরের বছর বীণার আবার একটি মেয়ে হোলো। উপরি-উপরি দুটি মেয়ে হওয়ায় জীবন যে খুসি হয়নি সে-কথা ঠিকই। তবে তার প্রায় সবগুলো দাঁতই নড়ে গেছে, ঘাড়ের কাছে কতকগুলি রোঁয়া ছাড়া আর চুলও নাই। তা ছাড়া লড়াই লেগে যাওয়ায় নানা ব্যবসায় তার প্রচুর টাকা আসছে। এই সব নানা কারণে মনের অসন্তোষ মনেই চেপে আবার সে গয়না গড়িয়ে দিলো বীণাকে। এবারে হোলো উপরহাতে সোনার তাগা, বেশ ভারি। তবু বীণা দুঃখ করে ভাবলো এ-বছর যদি তার বিছে-হার জীবন

গড়িয়ে দিতো তা হলে গতবারের চেয়ে অনেকটা সোনা বেশী লাভ হোতো।

তারপরের বছর বীণার সত্যি-সত্যিই একটি ছেলে হোলো। জীবন যখন প্রথম সেই ছেলেকে কোলে নিয়েছিলো বীণার চোখে দৃশ্যটা কেমন যেন ভালো লাগেনি। অনেকটা যেন নাতি-ঠাকুর্দার মতো দেখাচ্ছিলো তাদের দু'জনকে। জীবন বেজায় খুসি হয়ে এক রাস গয়না-কাপড় বীণার জন্যে যেদিন হাজির করলো সেদিন কিন্তু বীণার মনটা বিশেষ ভালো ছিলো না। তার দাদা এসেছিলো ভাগ্নেকে দেখতে। দাদার মুখেই খবরটা সে প্রথম শুনলো। অমিয় নাকি সেই কেরানিগিরি ছেড়ে দিয়েছে। এক মস্ত প্রতাপশালী বাঙালী চাকুরের নজরে পড়ে যাওয়ায় ছেষট্টি থেকে তার মাইনেটা হঠাৎ ছ'শোতে গেছে উঠে। অমিয় সেই সব কথা চিঠিতে জানিয়েছে। আরো জানিয়েছে সে ভাবছে এবারে বিয়ে করবে। পাত্রী সে নিজে দেখেই পছন্দ করেছে। লিখেছে, তাকে নিয়ে এলে সবাইকার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তবে চাকরির ব্যাপারে কী একটা অতি জরুরি কাজে তাকে হয়তো ইতিমধ্যে একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসতে হবে। হয়তো বছর খানেক, দেড় বছরও হতে পারে, বিলেত থেকে ফিরতে। ফিরেই সে বিয়ে করবে। চিঠির শেষে পরিষ্কার করেই লিখেছে মেয়েটি আর কেউ নয়—যিনি অমিয়র বরাত ফিরিয়েছেন তাঁরই একমাত্র মেয়ে।

সে-রাতটা ভারি যন্ত্রণায় বীণার কেটেছিলো। শরীরের কোথাও যন্ত্রণা নেই অথচ সর্বাঙ্গে একটা যন্ত্রণা-বোধ রয়েছে ; ঘুমে দু'চোখের পাতা বুজে আসছে অথচ ঘুমুতে সে পারছে না। ছেলেটা মাঝেমাঝে কাঁদছে। তার দিকে ফিরে চাইতেও তার ইচ্ছে করছে না। পাশের ঘরে জীবন দারুন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে—নেহাৎ আঁতুড় বলেই বীণার কাছে শোয়নি। বারবার বীণার ঐ একটি কথাই মনে পড়তে লাগলো : অমিয় বিয়ে করবে, অমিয় নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে! তবে সে কি সত্যিই ভুলে গেছে বীণাকে? সেই আঁতুড় ঘরের নিষ্প্রভ প্রদীপের আলোয় তিনটি শিশুর জননী বীণার কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই হঠাৎ কেমন যেন বিস্বাদ বলে মনে হোলো। অমিয় বিলেত যাবে লিখেছে। কত লোকেই তো জাহাজ ডুবে মরে। অমিয় মরে না?

কিন্তু সত্যিই অমিয় মরলো না। সে বেঁচে ফিরেছে বিলেত থেকে। ফিরেই বিয়ে করেছে। তার মাইনে এসে দাঁড়িয়েছে বারো শ'তে।

বীণার দাদা পরশু এসে বললো, "ওরে শুনেছিস, অমিয় তার বউকে নিয়ে শিলং যাচ্ছে। আমাকে জানিয়েছে ইস্টিশানে থাকতে। আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, এখানে একটা রাত কাটিয়ে যাবার জন্যে। কাল সন্ধেয় তারা আসবে। আমাদের বাড়ির তো ঐ ছিরি! বৌ নিয়ে কোথায় থাকবে? আমি বলি কি তোদের এখানেই একটা রাত কাটিয়ে যাক।"

জীবন এ প্রস্তাবটা শুনে তো প্রায় লাফিয়ে উঠলো। এ-অঞ্চলে একটা দেশী মদের কারবার করার জন্যে অনেক দিন থেকেই সে নানা চেষ্টা করছে। উৎসাহিত হয়ে বললো, "আরে, অমিয়বাবুর মতো মহাশয় ব্যক্তি আমাদের বাড়িতে উঠবেন এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা! তাঁকে দিয়ে একবার চিন্তামণি তালুকদারকে বলাতে পারলেই—ব্যাস। আমার লাইসেন্স মারে কে!"

ট্রেন লেট ছিলো। গতকাল রাতে অমিয় তার স্ত্রীকে নিয়ে যখন পৌঁছলো প্রায় তখন এগারটা। পল্লীগ্রাম—কোথাও কেউ তখন জেগে নেই। একটু আগেই তেঁতুল গাছটার ওপাশে ধনুকের মতো বাঁকা চাঁদ হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে অস্ত গিয়েছে। মাঝে-মাঝে কয়েকটা কোকিল অকস্মাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে ডেকে উঠছে। বীণার সমস্ত মাথা ঝাঁঝাঁ করছিলো, কান দুটো উঠছিলো গরম হয়ে। ফাল্গুনের শীত-শীত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সস্ত্রীক অমিয় আর তার স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার শরীরটা যেন জুড়িয়ে গিয়েছিলো। মনে হয়েছিলো আজ রাতেও জানলার ফাঁক দিয়ে চুপিচুপি সে বুঝি আবার অমিয়কে দেখতে পারে।

কিন্তু সেই মেয়েটিকে ভালো করে চিনতে-না-চিনতেই অমিয়রা শুয়ে পড়লো। অনেক দূর থেকে আসার জন্যে দু'জনেই তারা ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়া তারা ট্রেনেই শেষ করে এসেছিল।

জীবনের রাজকীয় আয়োজন সমস্তই নষ্ট হোলো। এই কোট-পেন্টুলুন-পরা ছিপছিপে চেহারার লোকটি—যার মুখে পাইপ, হাতে স্ত্রীর গরম কোট—যেন সেই অনেক বছর আগেকার নিতান্ত নিরীহ খদ্দরের পাঞ্জাবি-পরা অমিয় নয়, অন্য কেউ। এখানকার সবাইকার উপরিওলার মতো তার হাবভাব। তার স্ত্রী অপরাজিতাও হঠাৎ যেন আকাশ থেকে ভুল করে নেমে এসেছে এই পল্লীগ্রামে। পিয়ানোর শব্দের মতো মধুর গলায় বারবার সে হেসে উঠছিলো। তার চুল বব্ করা, চোখে চশমা। ভালো করে দেখতে পাবার আগেই দরজা বন্ধ করে দুজনে শুয়ে পড়লো। পাওডার আর এসেন্স-মেশানো গন্ধ, সিল্কের শাড়ির খসখস আওয়াজ আর পিয়ানোর মতো হাসির শব্দ—এইটুকুই যা খানিক বীণা জানতে পেরেছে অপরাজিতা সম্বন্ধে। আজ সকালে ভালো করে তাকে দেখতে হবে। দেখতে হবে কেমন সেই মেয়ে বীণাকে যে আঁচলের একটি ঝলকে একেবারে মুছে দিতে পেরেছে।

সেই পিঁপড়েগুলোর দিকে চেয়ে বীণা ভাবতে চেষ্টা করলো তার অনেক সোনার গয়না আছে, তার বাড়ি আছে, তার স্বামীকে গ্রামের সবাই সমীহ করে, তার ছেলেমেয়ে রয়েছে তিনটি—কিন্তু তবু মনে তার সুখ নেই। সমস্ত রাত জীবনের পাশে শুয়ে ছটফট করেছে। কেবল মনে পড়েছে অপরাজিতার ঐ হাসির শব্দ : মিষ্টি অথচ তীব্র। মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে। কিন্তু মেয়েমানুষের আবার অত হাসি কেন ?

"কখন উঠলে, বীণা ?"

অমিয়র স্বরে চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বীণা লক্ষ্য করলো সেই আবছা-সবুজ আলো আর ঘরের মধ্যে নেই। সিল্কের পাজামা ও ঢিলে কোটের উপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দাঁতের ফাঁকে পাইপটা কামড়ে ধরে অমিয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো লম্বা সে হয়েছে বুঝি। রঙটাও যেন আরো উজ্জ্বল। শুধু চশমাটা বদলায়নি, তার পিছনে একজোড়া কালো চোখ। আজ প্রথম বীণা আবিষ্কার করলো অমিয়র চোখ দুটো সত্যি ভারি সুন্দর ; টানা আর গভীর, কালো আর বড়-বড়।

"সেই বুড়ো বটগাছের তলায় সেদিন তুমি অপেক্ষা করেছিলে আমার জন্যে ?" রুদ্ধনিশ্বেসে প্রশ্ন করলো বীণা।

কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই অপরাজিতা ঘরে ঢুকলো। পায়ে ভেলভেটের চটি, গায়ে শাল, চোখে চশমা, পাওডার এবং এসেন্সর ফিকে গন্ধ এলো তার সঙ্গে-সঙ্গে।

অমিয় বোধ হয় বীণার প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি। বললো, "তোমাদের ভালো করে আলাপ করিয়ে দি, বুঝলে অপু—"

"বোসো ভাই বোসো, তোমাদের জন্যে আগে চা নিয়ে আসি।" অমিয়কে কথা শেষ করতে না দিয়েই দ্রুত পায়ে বীণা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বেরিয়ে যেতে-যেতে আজই প্রথম আবিষ্কার করলো সে বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে। অপরাজিতার তুলনায় রীতিমতো স্থূলকায়া গিন্নিবান্নি বৈকি !

কয়েক মিনিটের মধ্যে থালার উপর দু পেয়ালা চা আর ফল মিষ্টি সাজিয়ে বীণা ফিরে এলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো পাশাপাশি দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে তারা দুজনে বসেছে। এমন খাপছাড়া বেয়াড়া দৃশ্য বীণা আগে কখনো যেন দেখেনি। উপরের দাঁত দিয়ে তলার ঠোঁটটা বেশ জোরেই একবার সে কামড়ালো। থুতনি দিয়ে গলার কাছ থেকে ডানদিকের আঁচলাটা বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিলো খানিকটা, তারপর ঢুকলো।

"নাও, আগে খেয়ে নাও—পরে কবিত্ব কোরো।"

"সত্যি তোমাদের দেশ ভারি সুন্দর। এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।" বললো অপরাজিতা।

বাইরের তেঁতুলগাছটার কচিপাতায় সকালের পরিষ্কার রোদ ঝলমল করছে। ফাল্গুনের বাতাসে যেন শিউরে উঠছে সমস্ত গাছটা। সেদিকে চেয়ে বীণা বললো, "কত জিনিসই তো ভাই ইচ্ছে করে। তা কি আর হয় নাকি?" বলে সামনের দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ে আঁচলটা কায়দা করে আরো একটু সরিয়ে দিলো বীণা। "অমিয়দার সঙ্গে আগে যখন রেল-লাইন ধরে বেড়াতুম অমিয়দা কতদিন বলেছে—এই লাইন ধরে হেঁটে চলে যেতে তার ইচ্ছে করে—অনেক—অনেক দূরে যেতে, সবাইকার নাগালের বাইরে! কিন্তু তা কি আর হোলো?"

"সত্যি, অমিয়?" একটু কৌতুকের সুরেই অপরাজিতা বললো,

"তোমার মধ্যেও এতো কবিত্ব ছিলো? কিন্তু একাই যেতে চাইতে, নাকি কাউকে সঙ্গে নিয়ে?"

"একা কি ভাই কেউ যেতে চায়?" বলেই হেসে উঠলো বীণা, "আমাকে নিয়েই উধাও হতে চেয়েছে।"

পাইপের ভিতর থেকে অমিয় একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অপরাজিতাও হেসে প্রশ্ন করলো, "আর তুমি কী উত্তর দিতে?"

"আমি? আমি বলতুম রক্ষে কর অমিয়দা, আমি মোটা মানুষ, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবো কেন? আমার যে বৌদি আসবে—রোগা আর সুন্দর আর ছিপছিপে—সেই যাবে তোমার সঙ্গে! কেমন, ঠিক বলিনি?"

অমিয় আবার ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "কিন্তু তুমি চা খাবে না? নাকি এখনো ধরোনি?"

"ওমা! মনে নেই? তুমিই তো জোর করে চা ধরিয়েছিলে আমাকে? জানো বৌদি, তোমার বরটির কম উৎপাত কি আমাকে সহ্য করতে হয়েছে? মিনিটে-মিনিটে ওঁর চা না হলে চলতো না, তার ওপর বাবু আবার একা বসে চা খেতে পারতেন না। আমার তখন চা একেবারেই অভ্যেস হয়নি। তবু অমিয়দার পেয়ালা থেকে প্লেটে ঢেলে চা আমাকে প্রতিবারেই খেতে হোতো।"

"আজও ভাই তাই খাও," সেই পিয়ানোর শব্দের মতো

হাসিতে ফেটে পড়ে অপরাজিতা বললো, "আমার পেয়ালা থেকে কিন্তু ভাগ দিতে পারবো না।"

"তোমার পেয়ালা থেকে খেলে কিন্তু তোমার চা-ই একটু কম পড়বে, অমিয়দার থেকে নিলে তোমার আরো অনেক দামী জিনিস কমে যেতে পারে!"

কী করে যে কথাগুলো বলতে পারলো বীণা নিজেই জানেনা। কিন্তু সে আজ পুকুরের জলে ডুবতে চলেছে, তার ভয়টা কিসের?

ইতিমধ্যেই জীবন ঘুম থেকে উঠেছে। সম্মানিত অতিথিরা তার আগেই উঠে পড়েছে দেখে হন্তদন্ত হয়ে কাছাকোঁচা আঁটতে-আঁটতে ঘরে ঢুকলো। কথাটা তাই চাপা পড়ে গেলো। বীণা গেলো জীবনের জন্য চা-জলখাবার আনতে।

একটু পরেই এসে জুটলো বীণার ভাই।

অপরাজিতাকে নিয়ে বীণা এলো বাড়ির বাইরে, তেঁতুল-গাছের তলা দিয়ে একেবারে পুকুরপাড়ে।

"বাঃ, কী সুন্দর পুকুর তোমাদের? স্নান করা যায় না?"

"ওমা, চান করা যাবে না কি? নিশ্চয়ই যাবে। আমরা তো পুকুরেই চান করি। আমার বাপের বাড়িতেও পুকুর আছে। অমিয়দা তো পুকুর থেকে উঠতেই চাইতো না। আমাকে শুদ্ধ জোর করে টেনে নিয়ে যেতো পুকুরে আর সাঁতার শেখাবার নামে কী নাকানিচুবোনিই না খাওয়াতো!—তোমাকে সে-সব গল্প করেনি?"

"আমাকে অনেক গল্পই বলেনি দেখছি! বলবে বোধ হয় ক্রমশ। যা কাজের তাড়ায় বেচারাকে ব্যস্ত থাকতে হয়!—সে যাই হোক, আজ কিন্তু পুকুরে স্নান করবো।"

অপরাজিতাই যে কথাটা তুলবে বীণা ভাবেনি। অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে রাজী হয়ে বললো,"সবাই মিলেই নাইতে আসবো কেমন? সবাই মিলে না নাইলে কি আর মজা লাগে?"

জীবনের বিশেষ ইচ্ছে ছিলো না সবাই একসঙ্গে পুকুরে নামে। গ্রামের লোকেরা জানলে বলবে কী? কিন্তু স্বয়ং অমিয়র স্ত্রীর এই প্রস্তাব এবং অমিয়কে একটু আগেই সেই দেশী মদের লাইসেন্সের কথাটা বলেছে। তাই তার মনে হোলো আপত্তি করা বোধ হয় ঠিক হবে না।

বারোটার প্যাসেঞ্জারে উঠে সামনের জংশন ইস্টিশন থেকে অমিয়রা মেল ধরবে। বিশেষ দেরি আর নেই। স্নানের পাটটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে অমিয়ও কম ব্যস্ত নয়। কিন্তু জলে নেমে অপরাজিতা আর বীণা উঠতেই চায় না। জীবন আগেই জল থেকে উঠে পড়েছিলো। তার আবার শ্লেষ্মার ধাত।

তারপর উঠে পড়লো অমিয়।

আর তারপর একটু গভীর জলে গিয়ে ডুবতে চেষ্টা করলো বীণা। কিন্তু হায় হায়, ডোবা যে এতো শক্ত কে জানতো সে-কথা? সাঁতার জানা থাকলে ডুবতে হলে যে গলায় একটা দড়ি আর কলসি বেঁধে নিতে হয় এই সহজ কথাটা বীণা ভুলে-

ছিলো কী করে ? তাই ডোবা আর তার হোলো না। অনর্থক কয়েক ঢোক জল খেয়ে সে উঠে এলো অপরাজিতার সঙ্গে।

তারপর কোথা দিয়ে যেন হুড়মুড় করে তাড়াহুড়োর মধ্যে কেটে গেলো সমস্ত সময়। বীণার দাদা আর জীবন গেলো তাদের ইস্টিশানে তুলে দিতে। যাবার সময় অপরাজিতা আবার সেই পিয়ানোর মতো মিষ্টি মধুর গলায় হেসে উঠলো। পুরু চশমার পিছনে অমিয়র চোখ দুটোয় এতক্ষণে একটা নিশ্চিন্ত আরামের ভাব ফুটে উঠেছে দেখলো বীণা।

তারা চলে গেলো। ছেলেমেয়েদের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো বীণা। বাড়িটা ফাঁকা। হঠাৎ অসীম শূন্যতা এসে তাকে যেন গিলে ফেলতে লাগলো। সকালের সেই চেয়ারটিতে এসে অন্যমনস্ক হয়েই সে আবার বসে পড়লো। অমিয় তাকে ভুলে গেছে, অমিয়র জীবন থেকে চিরকালের জন্যে সে মুছে গেছে। ভাবতে-ভাবতে টপ-টপ করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

সকালের সেই পিঁপড়েগুলো থাকলে তাদের পিঠেই বীণার চোখের জল পড়তো। পিঁপড়েগুলো ভাবতো বুঝি নোনা সমুদ্র তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভালো করে চেয়ে বীণা দেখলো সকালের সেই এক ফোঁটা চা আর নেই, পিঁপড়েগুলোও কোথায় যেন চলে গেছে। তেঁতুল-গাছের পাতার ফাঁকে বসে একটি কোকিল শুধু-শুধুই ডেকে মরছে। বীণাকে সে দেখতে পায়নি, তার চোখের জলকেও না।

রেল লাইন

পায়ে পুরু ক্রেপ-সোল লাগানো সম্বর চামড়ার জুতো, পরনে গাঢ়-সবুজ গরম ট্রাউজার, তার উপর ফিকে-সবুজ সার্জের জার্কিন জিপ-ফাসনার লাগানো; ভিতর দিয়ে সিল্কের লাল টাইটা টকটক করছে; বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপটা দু-দিক থেকে নেমে ডানদিকের কোমরে ছোট্ট চামড়ার কেসে এসে থেমেছে—ভিতরে ঝকঝকে লাইকা ক্যামেরা। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা। দু-পাশের জুলপির কাছে পাক ধরেছে। মাথার বাঁ-দিকে, যেখান থেকে সিঁথি কাটে, অনেকটা চুল ওঠা। কপালটা তাই বেশ প্রশস্ত লাগে। খুব সুন্দর চুল ছিলো এক কালে, পশমের মতো নরম, কাকের মতো কালো। এখনো, অনেক উঠে যাওয়া এবং পেকে যাওয়া সত্ত্বেও চুল তার ভালো।

এমন সাজে, এমন চেহারায় একটা লম্বা পাইপ অজয়কে খুব ভালো মানাতো। কিন্তু পাইপটা কিছুতেই সে অভ্যেস করতে পারেনি, বরাবর জিভে ফোস্কা পড়ে। একটা দামী ইজিপশিয়ান সিগারেট টানছিলো। চার বছর লড়াই চলবার পরেও যারা এ-ধরনের সিগারেট এখনো টানতে পারে এবং শুধু টানা নয়, অর্দ্ধেকটা পোড়বার আগেই সেটা মাটিতে ফেলে জুতোর হিল দিয়ে পিষতে পারে, নিঃসন্দেহে তারা ভাগ্যবান পুরুষ।

বাস্তবিক অজয় ভাগ্যবান। কারণ শুভ্রার বাড়ির সামনে থেমে পুরু ধুলোয় আধপোড়া ইজিপশিয়ান সিগারেটটা ফেলে তার নতুন জুতোর তলায় পিষতে-পিষতে বাঁ হাতের কব্জিটা একটু তুলে একটু বেঁকিয়ে সৌখিন রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়িটা দেখলো। ঘড়ির উপর পৌনে-পাঁচটার ঝুঁকে-পড়া শীতের সূর্য তার উজ্জ্বল রক্তাক্ত দেহ দিয়ে চোখ ঝলসিয়ে দিলো। গত আধ ঘণ্টা ধরে বাতাস বন্ধ। তাই সিগারেট ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও একটা মধুর নতুন ধরনের গন্ধ সেখানকার বাতাসে জড়িয়ে রইলো।

ঘর থেকে বেরিয়েই শুভ্রা প্রথম কথা বললো, "বাঃ, চমৎকার গন্ধ তো! কী সিগারেট?"

"ভুলে গেলে? থার্ড ইয়ার থেকে আজ পর্যন্ত এই একই সিগারেট তো ব্যবহার করি।"

"ওঃ! হ্যাঁ! তাই তো! দেখো দিকিনি কী ভোলা মন!"

"যাক্, আমাকে যে ভোলোনি এই যথেষ্ট! বাস্তবিক, কাল বিকেলে ইস্টিসানে তুমি যখন ডাকলে প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই পারিনি। এক হাতে স্টলের এক ভাঁড় চা, অন্য হাতে দু-খিলি পান—তোমাকে যখন দেখলুম আর তোমার মুখে আমার নাম যখন শুনলুম তখন...."

"তখন ভয় পেলে এই বুঝি মান-ইজ্জত আর বজায় রইলো না! না?" বলে একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠেই সমস্ত আকাশময় শুভ্রা তার হাসি ছড়িয়ে দিলো। মধুর নয় সে হাসি—অনেক পোড়-

খাওয়া কোনো শক্ত ধাতুকে পাথর দিয়ে ঠুকলে যে-রকম আওয়াজ বেরোয় তার হাসির শব্দ অনেকটা সেই রকম।

"না-না তা নয়, তবে...."

"এখনো তোমার সেই অপ্রস্তুত হওয়া আর লজ্জা-লজ্জা চোখ করে চেয়ে থাকা যায়নি দেখছি! ভারি আশ্চর্য তো!"

"না-না তা নয়; সত্যি, তোমাকে দেখে যে কী খুসি হয়েছিলুম! কিন্তু ভাঁড়ের চা-টা—ও-সব না খাওয়াই ভালো। জানো না তো কী রকম অপরিষ্কার থাকে!"

"ভাঁড়ে করে কত খারাপ জিনিস খেলুম—কাল তো শুধু চা"—

"মানে?"

"মানে আর হ্যাতি-ঘোড়া কী! এখানে এসে ভাবলুম সাঁওতালদের দেশেই আসা বৃথা যদি না মহুয়ার রসটা নিজে চেখে দেখি!"

রুদ্ধ-নিশ্বেসে অজয় বললো, "যাঃ, কী বলছো?"

আবার সেই ধাতব হাসি হেসে শুভ্রা উত্তর দিলো, "অত ভয় পাচ্ছো কেন? সত্যি, এক চুমুক চেখেই ফেলে দিয়েছি! মহুয়া তোমাদের রবিঠাকুরের কবিতাতেই ভালো। এক চুমুক খেতে-না-খেতেই অন্নপ্রাশনের অন্ন যেন উঠে এলো। থু-থু করে ফেলে দিয়ে বাঁচি।"

"কেন যে ও-সব ছাই-পাঁশ শখ মাথায় চাপে!"

বাঁ-দিকে উঁচু রেল-লাইন, তার ওপাশে উঁচুনীচু সবুজ চোরকাঁটা-ভরা মাঠ, আরো দূরে পাহাড়ের তরঙ্গ। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে এবারে আরো চড়া গলায় না হেসে অনেকটা যেন ফিস-ফিস করে শুভ্রা বললো, "জীবনে তো অনেক রকম স্বাদই পেলুম! তাই ভাবলুম মহুয়াটাই বা আর বাদ থাকে কেন?" বলে আবার সে অস্পষ্ট হাসলো। তার বড়-বড় কালো চোখ, শীর্ণ শরীর, রুক্ষ চুল, ডানদিকের গালের উপরকার বয়সের কয়েকটি রেখা—সবকিছু মিলিয়ে এই ডিসেম্বরের সোয়া-পাঁচটার সূর্যের নরম আলোয় সেই হাসিকে ভারি করুণ দেখালো।

অজয় সেদিকে চেয়ে একটু যেন বিমর্ষ হোলো।

খানিকক্ষণ শুকনো কাঁকর আর পাথরকুঁচির উপর তাদের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেলো না। আরো খানিক পরে শুভ্রাই আবার কথা বললো, তার স্বরে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো হতাশা নেই। একেবারে সুস্থ আর স্বাভাবিক গলা।

"যাই বলো—তোমাদের হোয়াইট-লেবেল কিংবা সাঁওতাল-দের তাড়ি—কফির কাছে কেউ-ই লাগে না। দিনে সাতবার কফি না খেলে আমার তো চলেই না। এই দেখো ফ্লাস্কে ভরে এনেছি। অনেক-অনেক বছর পরে তোমার জন্যে আজ আবার কফি বানালুম। স্টোভের ওপর পারকোলেটারে জল যখন শিষ দিচ্ছিলো, জানো, তখনই আজ প্রথম মনে পড়লো কতদিন পরে আবার আমাদের দেখা! অনেক হাজার দিন হয়ে গেছে, তাই না?"

"আজকের দিনে অনেক হাজার দিনের কথা ভাবছো কেন? আবার যে আমরা কাছাকাছি এসেছি, আবার যে পাশাপাশি হাঁটছি—এইটাই তো সবচেয়ে বড় সত্যি। যে-সব দিনে আমরা কাছাকাছি ছিলুম না সে-সব দিনগুলো তো একান্তই মিথ্যে, তাদের কথা ভাবতে ভালো লাগে না।"

বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গালের উপরকার এক গোছা রুক্ষ চুল সরিয়ে শুভ্রা বললো, "এখনো সেই রকম মিষ্টি করে কথা বলতে পারো দেখছি!" একটু থেমে একটু ফিকে হেসে বললো আবার, "ভাগ্যিস তোমার স্ত্রীর অসুখ করেছিলো!"

হঠাৎ ঠিক বুঝতে না পেরে অজয় প্রশ্ন করলো, "কেন?"

"তা না হলে কি আর এখানে আসতে? স্ত্রীকে নিয়ে চেঞ্জে আসবে বলেই তো এসেছো।"

ততক্ষণে অজয়ের গতকালের কথাগুলো মনে পড়ে গেছে।

"হ্যাঁ, সত্যিই তাই। একটা ভালো বাড়ির খোঁজে এসেছিলুম। পেয়ে গেছি। এবারে ওদের নিয়ে আসতে হবে।" দু-হাতের গহ্বরে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে সে বললো, "আমার কিন্তু যেতে আর ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে এখানে থেকে যাই।"

"ইচ্ছে করছে নাকি?' যেন প্রকাণ্ড একটা কৌতুকের খবর পেয়ে শুভ্রা প্রশ্ন করলো। "এই ইচ্ছেটা অনেক আগে করলে আজকের চেহারাটা এ-রকম হোতো না।"

"মানে—"

"মানে আমার যখন বাইশ বছর আর তোমার যখন তেইশ এ-ধরনের ইচ্ছেটা তখন হলেই শোভন হোতো। আজ আর সে-কথা বলে লাভ নেই।"

"সত্যি বিশ্বাস করো—তোমাকে ছেড়ে বিলেতে যেতে একটুও উৎসাহ ছিলো না। সে-কথা তো জানোই।"

"তখন মনে হয়েছিলো জানি—এখন মনে হয় কিছুই জানতুম না তখন!"

"কেন এখন ও-কথা মনে হয় বলবে?"

"থাক গে। মিছে তর্ক করে লাভ নেই।"

"না-না, তর্ক নয়। এটা একটা কৌতূহল।"

"আমার ওপর তোমার যে কৌতূহল ছিলো সেটা তো মিটেই গেছে। আজ এ-কৌতূহলটা না মিটলেও চলবে।"

"তোমার ওপর কৌতূহল—"

"পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র অজয় যখন শুভ্রা নামে মেয়েকে পাশে বসিয়ে প্রিন্সেপস্ ঘাটে হাওয়া খেতো তখন অবশ্য মনে হোতো শুভ্রাকে সে ভালোই বাসে। আজ অনেক দিন পরে দূরের জিনিসটাকে সত্যিকারের আলোয় দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে প্রেম নয়, কৌতূহল।"

"ছি-ছি, কী করে তুমি বলতে পারলে?"

"দেখো অজয়," চাপা উত্তেজিত কঠিন স্বরে শুভ্রা বললো,

"সত্যি কথাটাকে দেখতে চাইবো না বলে চোখ বুজে থাকা আমার স্বভাব নয়। তোমাকে বানিয়ে কথা বলে আমার লাভ? অনেক হাজার দিন পরে আজকের সন্ধেয় দেখা হোলো—আবার অনেক হাজার দিন হয়তো দেখা হবে না। হয়তো কখনোই আর দেখা হবে না। তুমি ভাবছো আজকের এইটুকু সময়কে মিথ্যে কথা দিয়ে ভরে দেবার মতো মূর্খ আমি?"

"সত্যি শুভ্রা," তার একটি হাত নিজের মুঠোয় ভরে অজয় বললো, "সত্যি—তোমাকে আমি প্রথম ভালোবেসেছিলুম। তোমাকেই ভালোবেসেছি শেষ। এতোগুলো বছর পার হয়ে গেছে, পৃথিবীর রঙ কত বদলেছে, কিন্তু আমার সেই ভালোবাসা আজও মরেনি। এমন একটি দিনও কি গেছে যেদিন তোমার কথা না ভেবেছি! যদি জানতে শুভ্রা তোমাকে কী ভীষণ ভালোবাসি—"

"তুমি তো বিয়ে করেছো!"

"কিন্তু বিয়ে দিয়ে কি ভালোবাসাকে মুছে ফেলা যায়?"

"তোমার ছেলেপিলে কটি?"

"কেন? তিনটি।"

"ছোটোটির বয়েস কত?"

"মাত্র দেড় মাস। কালকেই তো আমার কাছে শুনলে ছোটটি ভূমিষ্ঠ হবার পরেই স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ চলেছে। ডাক্তার বলেছে কোনো ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় নিয়ে যেতে, সেই

জন্যেই তো দু-মাসের ছুটি নিয়ে এখানে বাড়ি দেখতে এসেছি—এ-সব কথা কি কাল বলিনি ?”

“হ্যাঁ, বলেছিলে। কিন্তু তখন তো প্রেমের কথাটা বলোনি।”

“ভালোবাসার কথাটা কি মুখ ফুটে বলতেই হবে ?”

“না বলাই ভালো।”

“না বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে না ?”

“বিশ্বাস করা একটু কঠিন বৈকি ! যে বিয়ে করেছে, যার তিনটি ছেলেমেয়ে এবং ছোটোটির বয়েস মাত্র দেড় মাস, সে যদি বলে এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন আমার কথা ভেবে মনে-মনে চোখের জল না ফেলেছে তার কথাটা বিশ্বাস করা কি কঠিন নয়, অজয় ? কিন্তু”, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শুভ্রা বললো, “আর কত হাঁটাবে ? পা ধরে গেছে। ঝাঁঝাঁ পর্যন্ত হাঁটতে রাজি নই। এসো, এই পাথরটায় বসি।”

ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। দূরের পশ্চিম-আকাশ অসহ্য লাল রঙে পলাশের মতো রঙীন। পাখীর বুকের রোঁয়ার মতো অনেক ছেঁড়া-ছেঁড়া স্থির মেঘ পশ্চিম-আকাশে জড়িয়ে রয়েছে আর সেই মেঘের উপরকার লাল রঙ মুঠো-মুঠো আবিরের মতো সমস্ত পৃথিবীতে পড়ছে ঝরে। সে-রঙ শুভ্রার শীর্ণ-রেখা-আঁকা মুখের উপর পড়ায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিলো। এক কালে সে যে সত্যিই সুন্দরী ছিলো এখন কয়েক মুহূর্তের জন্য সে-কথা অবিশ্বাস করা যাবে না।

একটা বিরাট কালো পাথর সামনের মাটি ফুঁড়ে যেন উঠেছে। অনেকটা মোষের পিঠের মতো দেখতে। সেই পাথরে তারা বসলো। বসবার আগে অজয় তার মস্ত বড় সিল্কের রুমাল দিয়ে দিলো পরিষ্কার করে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে খুব আস্তে বললো, "আমি যে কী রকম দুঃখী সে-কথা যদি জানতে!"

কথাটা শুভ্রা ঠিকমতো শুনতে পায়নি। অবাক হয়ে তার বড়বড় চোখ তুলে সূর্যাস্তের আকাশ আর একটি কালো পাহাড়ের পাশাপাশি দুটো চুড়োর দিকে চেয়েছিলো। সে-দিকে চেয়েই বললো, "এখানকার এ-রকম সূর্যাস্তের জন্যেই বোধ হয় নাম হয়েছে শিমুলতলা! হঠাৎ যেন লক্ষ-লক্ষ শিমুল ফুল ফুটে উঠলো, নয়?" তারপর অজয়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে বললো, "দুঃখের কথা কী বলছিলে? তুমি খুব দুঃখী?"

প্রশ্নটা এমন ভাবে করলো যে ভিতরে কোনো খোঁচা কিংবা ব্যঙ্গ লুকোনো আছে কিনা অজয় স্পষ্ট ধরতে পারলো না। তাই অনেকটা সাবধান হয়েই পালটা প্রশ্ন করলো সে, "যদি তাই বলি তা হলেও কি ঠাট্টা করবে?"

"না, ঠাট্টা করবো না, শুধু জানতে চাইবো এখন কত টাকা মাইনে পাও। দু-হাজারের ওপর নিশ্চয়ই এতোদিনে উঠেছে!"

"যদি উঠেই থাকে তা হলেই কি মনে করবে আমি খুব সুখী? মোটা মাইনের চাকরি করলেই যদি সুখী হওয়া যেতো—"

"দেখো, ও-সব পুরোনো কথা বোলো না। ভারি বিরক্ত লাগে। আগে তোমার মস্ত একটা গুণ ছিলো কখনো পুরোনো খেলো কথা বলতে না। যদি বলো এখনো তিন হাজার রোজগার করতে পারছো না বলে অসুখী কারণ তোমার চেয়ে অনেক অপদার্থই এই লড়াইয়ের বাজারে তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করছে, তা হলেও খুসি হবো। কিন্তু সে-রকম কোনো দুঃখের কথা না বলে যদি শস্তা উপন্যাসের নায়ক কিংবা খেলো বাংলা-সিনেমার হিরোর মতো হতাশ প্রেমের বুলি আওড়াও তা হলে বুঝবো অবনতির শেষ স্তরে পৌঁচেছো। তা হলে তোমায় জন্যেও দুঃখিত হব, নিজের জন্যেও লজ্জা পাবো। এ-কথাটা যে কিছুতেই ভুলতে পারি না তোমাকে একদিন কী অসম্ভব ভালো-বাসতুম!"

একটু চুপ করে থেকে অজয় প্রশ্ন করলো, "বাসতুম কেন, এখন কি আর বাসো না?"

শুভ্রার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। সেই জ্বলজ্বলে চোখ তুলে অজয়কে যেন নতুন করে দেখতে লাগলো। মুখ ফিরিয়ে তারপর পাথরের উপর আঙুল দিয়ে চললো হিজিবিজি কেটে।

"কী! উত্তর দিলে না?"

"কি জানি! ভালোবাসা বলে কিছু আছে কিনা আজ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"এটাও কিন্তু একটা শস্তা আধুনিক কথা হোলো।"

"সম্ভবত তাই।"

ততক্ষণে পশ্চিম আকাশের অসহ্য লাল রঙ মিলিয়ে এসেছে। শুধু সেই কালো পাহাড়ের দুই চুড়োর মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে একটি তারা, মস্ত বড় এক হীরের মতো দেখতে।

"শিমুলতলায় এসে জীবনে এই প্রথম ভেনাস-কে ভালো করে চিনলুম।" অনেকটা খাপছাড়া সুরেই শুভ্রা বললো।

"কাকে?" অজয় প্রথমে ভালো করে বুঝতে পারেনি। তারপর শুভ্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে বললো, "ও, ভেনাস-কে!"

মুখ না ফিরিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে শুভ্রা বলে চললো, "পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ জন্মায় যারা নিজেদের হতাশ-প্রেমিক বলে ভাবতে না পারলে কিছুতেই সুখী হয় না। কিছু মনে কোরো না অজয়, তুমি সেই জাতের লোক!—আমি তো স্পষ্ট দেখছি তোমার অসুখী হবার কেনো কারণই নেই। নিজের স্বাস্থ্য ভালো, মোটা মাইনের চাকরি করো, শুনেছি তোমার স্ত্রী বাংলাদেশের নামকরা সুন্দরী—তোমার আবার দুঃখ কিসের! এই মনগড়া দুঃখ বানিয়ে নিজেকে দুঃখী বলে ভাবতেই তোমার ভালো লাগে! —তর্ক করতে এসো না। এই সত্যি কথাটা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। দুঃখ-দুঃখ শুধু মুখেই বলতে পারো—কিন্তু আসল দুঃখের খবরটা যদি কোনোদিন দেখতে পেতে, যদি জানতে চাইতে—"

"দুঃখ এমনি একটা জিনিস না চাইলেও তাকে প্রচুর পাওয়া যায়। আমি পেয়েছি।"

"সুখও এমন একটা জিনিস না-চাইলেও প্রচুর মেলে। তা-ও তুমি পেয়েছো।"

"হ্যাঁ সে-কথাটাও অস্বীকার করবো না। কলেজে তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর তিন বছর ধরে ক্রমাগত মনে হয়েছিলো বটে পৃথিবীতে আমার মতো সুখী খুব কম লোকই আছে।"

"এখনো তোমার মতো সুখী লোকের সংখ্যা খুব বেশি আছে বলে মনে কোরো না।"

"জোর করে আমাকে আজ সুখী বানাতে গিয়ে কী প্রচণ্ড দুঃখ দিচ্ছো যদি জানতে, শুভ্রা—"

"এইটাই তো এক ধরনের লোকের সুখী হবার একটা উপায় —নিজেকে সবাইকার চেয়ে দুঃখী ভাবা। কিশোর বয়সে এই ধরনের দুঃখী ভেবে সবাই আনন্দ পায়। তোমার এডোলেসেন্স এখনো কাটেনি দেখছি।"

"শুধু তোমারই কেটেছে, না?" একটু গরম হয়েই প্রশ্ন করলো অজয়। "শুধু তুমিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী—"

"আমার মতো আরো অনেক মেয়েই আছে যারা ভালো-বেসেছিলো, ভালোবাসা পেয়েছিলো, তারপর হারিয়েছিলো—"

"তারপর আর কিছু নেই?"

"তারপর কত রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছে, ঘর বাঁধতে চেয়েছে, নিজেকে কাজে লাগাতে চেয়েছে কিন্তু পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা নৌকোর মতো শুধু ঘর-ছাড়া হয়ে ঘুরে-বেড়ানো ছাড়া আর কিছু পায়নি। অনেকে আছে বৈকি এ-রকম—তবে ভাবতে ভালো লাগে না তাদের সংখ্যা খুব বেশি।"

"কিন্তু দোষটা কি শুধু আমার? বিলেতে যাবার ছ-মাসের মধ্যেই তো তুমি জানালে আমাদের বিয়ে হতে পারে না।"

"জানিয়ে তো ভালোই করেছিলুম। সত্যিই তো কোনো সরকারি চাকুরেকে বিয়ে করা সম্ভব ছিলো না। তুমি সমস্ত দিন সরকারি অপিসের যে-সব তকমা-আঁটা আর্দালিদের সেলাম নিচ্ছো তাদেরই বস্তিতে-বস্তিতে আমার যে সমস্ত দিন-রাতের কাজ! তুমিই বলো আমাদের কি মিলতো? তোমার ভালোবাসা আর চাকরি কোনোটাই বেশিদিন টিঁকতো না। তোমার দিক দিয়ে ঠিকই করেছিলে, অজয়। বড় চাকরির মসৃণ গদির লোভে আমাদের দেশে তোমার চেয়েও অনেক ভালো ছেলে বিকিয়ে গেছে, অপদার্থ হয়ে গেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে। এর জন্য শুধু তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দিই-ও না।"

কী একটা বলতে যাচ্ছিলো অজয়। তাকে থামিয়ে হঠাৎ অন্য গলায় শুভ্রা চেঁচিয়ে উঠলো, "দেখো-দেখো কী সুন্দর চাঁদ উঠছে! প্রতিপদের চাঁদ!"

পশ্চিম-দিকে সূর্যাস্তের আলো এখনো সামান্য লেগে রয়েছে

শুধু সেই কালো পাহাড়টার পাশাপাশি চুড়ো দুটো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন। আর তার মাঝখানে হারের মতো ভিনাস-কে আরো জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে! কিন্তু পূবদিকে এতক্ষণ ঘন অন্ধকার ছিলো। হলদে জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ জোয়ার এনে টলটলে ঘন হলুদ-রঙের একটি চাঁদ আসছে উঠে। যেন সবে আগুন থেকে বেরিয়ে এলো, এখনো ঠাণ্ডা হয়নি বলে তার সমস্ত শরীরটা জমে কঠিন হয়ে ওঠার সময় পায়নি।

"না চাইলেও যে আনন্দ পাবার কথা বলছিলুম, এই দেখো, চোখের সামনে প্রমাণ হয়ে গেলো!" একটু হালকা সুরেই শুভ্রা আবার বললো।

অনেকক্ষণ মন দিয়ে চাঁদকে দেখলো অজয়, তারপর বললো, "আমার জীবন থেকে চাঁদ মরে গেছে, আজ বুঝতে পারলুম!"

"মরা জিনিস আবার মরে নাকি?—তোমার ভারি দোষ অজয়, ভালো লাগলেও ভালো বলতে চাও না! সব সময় নাটুকে ভাষা হাৎড়ে বেড়াও বলে কথাগুলো এতো শস্তা লাগে!—এসো, একটু কফি খেয়ে গরম হয়ে নাও। শরীরটা গরম হলে মাথাও পরিষ্কার হবে।" বলে ফ্লাস্কের প্যাঁচ খুলে উপরকার ঢাকনাতেই শুভ্রা গরম কফি ঢাললো। হলদে জ্যোৎস্নায় গরম কফির ধোঁয়া সোনালি কুয়াশা হয়ে উঠলো।

অজয় কিন্তু নিলো না।

"কী! নেবে না?"

খানিকটা অভিমান-ক্ষুব্ধ সুরেই অজয় বললো, "না, থাক। তোমার কথাগুলোই যথেষ্ট গরম। কফির দরকার নেই।"

"থাকগে। খেলে ভালোই লাগতো। না-খেয়ে রাগ দেখাবার বয়েস তোমারো নেই, আর তুমি না খেলে খাবো না বলার বয়েসও আমার গেছে। কিছু মনে কোরো না, আমি খেতে আরম্ভ করছি।" বলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খুব ধীরে-ধীরে শুভ্রা কফিতে চুমুক দিতে লাগলো।

ততক্ষণে চাঁদের চেহারা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে! সেই হলদে জ্যোৎস্নার বদলে শাদা আলোয় খোলা মাঠ ভরে উঠেছে। পৃথিবী ছেড়ে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে সেই চাঁদ।

একটা উদাস সুরে, যেন কথা বলতে হয় বলেই, অজয় প্রশ্ন করলো, "কবে এলে?"

"কি জানি! বাইরে এলে আমার বার-তারিখ মনে থাকে না। দিনের হিসেব গুলিয়ে যায়। বারো দিন হতে পারে, কুড়ি দিন হওয়াও বিচিত্র নয়।"

"আর কে এসেছে তোমার সঙ্গে?"

"কে আবার আসবে! একাই এসেছি।"

"বিদেশে একা একটা বাড়িতে আছো! ভয় করে না?"

"নাঃ, ভয় আর করে না। যার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে, ছিঁচকে চোরকে তার আবার ভয় কিসের?"

একটু হেসে অজয় বললো, "ছিঁচকে চোর না হয়ে আবার ডাকাতও পড়তে পারে তো!"

"তা পড়তে পারে বটে কিন্তু লুঠ করবার মতো কোনো জিনিস ভাঁড়ারে আর নেই। ফলে ভয়ও নেই ডাকাতকে!"

ফ্লাস্কের মুখে ছিপি এঁটে তার উপর বেকেলাইটের ঢাকনার প্যাঁচ শক্ত করে লাগিয়ে সাবধানে ফ্লাস্কটা পাশে নামিয়ে রাখলো শুভ্রা। তারপর মুখ ফিরিয়ে দূরের সেই পাহাড়ের চুড়ো দুটোর দিকে চেয়ে একটু ফিকে হাসলো। চাঁদের উল্টো দিকে মুখ ছিলো বল চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করে উঠলো না।

"সব কথাই তো জিগগেস করলে, কিন্তু কেন এসেছি সে কথা তো জানতে চাইলে না!"

উঠে দাঁড়িয়ে জার্কিনটা ঠিক করতে-করতে অজয় বললো, "চলো, ফিরতি-পথে সে-কথা শুনবো।"

"অত রাগ কোরো না," আবার সেই ধাতব কণ্ঠে জোরে হেসে উঠলো শুভ্রা। অজয়ের হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললো, "কী-ই বা এমন রাত হয়েছে! বোসো না! ইংরিজিতে বলতে গেলে রাত তো এখনো সবে কুমারী, দিশি ভাষায় যাকে বলে সবে কলির সন্ধে! ঠিক না?"

"কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় কে বলবে। মনে হচ্ছে আমাদের এই দেখা না-হলেই ভালো হোতো।"

"তোমার পক্ষে ভালো হোতো না, অজয়। নইলে এই আধ-বুড়ো হয়েও বয়েস তোমার বাড়তো না। আশাকরি আজ থেকে তোমার এডোলেসেন্স খানিকটা কেটে যাবে।"

"তাতে কি খুব একটা কিছু লাভ হবে ?"

"হবে বৈকি! প্রত্যেক বয়সেরই তো নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সেটা পালন করাই ভালো। ছোটো ছেলেকে বুড়ো মানুষের মতো কপাল কুঁচকে বিজ্ঞ সেজে বসতে দেখলে যেমন খারাপ দেখায় বুড়ো মানুষকেও তেমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে দেখলে রাগ হয়।—কিন্তু আর কথা বাড়াবো না। কাল সকালের ট্রেনেই তো তুমি কলকাতায় ফিরবে। আর হয়তো দেখা হবে না। যে-কথাটা বলতে চাই বলেই ফেলি।"

"বলো।"

"কেন এখানে এলুম সেখান থেকে সুরু করতে হয়। না, ঠিক সেখান থেকেও না—তারো আগে থেকে। তুমি তখন তিন বছর বিলেতে। আর আমি হাওড়ার মজুরদের মধ্যে কাজ করছি। শরীরটা তখন এ-রকম ভেঙে যায়নি। পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলেই মনে হোতো না। কাজটা তখন ঠিক নেশার মতো পেয়ে বসেছে। মজুরদের মধ্যে কাজ করার আনন্দ তুমি জানো না, অজয়। জানতেও পারবে না। কোনোদিন। শুধু এটুকু ভেবে নিয়ো সে-আনন্দ মাসে দু-হাজার রোজগার করা কিংবা নিজেকে হতাশ-প্রেমিক বলে ভাবার চেয়ে অনেকগুণ বেশি।—"

"ভেবে নিলুম, তারপর ?"

"তাদের বস্তির মধ্যে দেখেছি আসল দুঃখ কী, আসল মানুষ কারা।—"

"খুব ভালো কথা। তারপর?"

"তারপরের কথাটাই তো বলছি। জানি বস্তির কথায় তোমার মতো অভিজাতের মন পাবো না। তার পরের কথাটায় পাবো। কারণ সেটা প্রেমেরই কথা—তোমার কল্পনার নাগালের মধ্যে।—আমার সঙ্গে সন্তোষ কাজ করতো। আই. এ. পাশ করে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে সে-ও তখন কাজে নেমেছে। মুখে বসন্তর দাগ, কালো রঙ, ছিপছিপে লম্বা গড়ন। মোট-কথা এমন্ চেহারা নয় যাকে দেখে প্রেমে পড়া চলে। তা ছাড়া আমার চেয়ে অন্তত সে পাঁচ বছরের ছোটো। কিন্তু কাজের নেশায় এমনই তখন মশগুল যে তার চোখের আসল চাউনিটা কোনোদিনই ধরা পড়েনি।"

"কবে পড়লো?"

"তার চাউনিকে কোনোদিন ধরতে পারিনি। যেদিন ধরা পড়লো একেবারে সবশুদ্ধু্ই ধরা পড়লো! মিলে তখন জোর স্ট্রাইক চলেছে। মজুররা বলেছে তাদের জন্যে পাকা বাড়ি করে দিতে হবে আর অসুখ-বিসুখে ডাক্তার আর ছুটির বন্দোবস্ত করতে হবে। কারণ সে-বছর পাটের ব্যবসায় কোম্পানি দেড় কোটি টাকা লাভ করেছিলো আর সেই লাভের মূলে ছিলো মজুরদের রক্ত জল-করা পরিশ্রম।—যেমন হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও

ঠিক তেমনি হোলো। কর্তারা বললেন মিল বন্ধ করে দেবো, কিন্তু মজুরদের চোখ-রাঙানি শুনবো না। দিন পনেরো এক ভাবে ধর্মঘট চালাবার পর মালিকদের দুর্বলতার খবর ধীরে-ধীরে জানতে পারলুম। সন্তোষ এসে বললো, 'দিদি, কর্তারা বলছে তুমি আর আমি যদি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করি—মানে মজুরদের আর না বিগড়ে দি—তা হলে বিশ হাজার টাকার একটা দাঁও মারা যাবে। রাজী?' বলে সে হো-হো করে হাসতে লাগলো। আমিও হাসলুম। তারপর সন্ধেয় দুজনে হাওড়ায় চললুম মজুরদের বস্তিতে—যারা যোগ দেবে বলে উসখুস করছিলো তাদের কাছে মালিকদের এই দুর্বলতার কথাটা ফাঁস করতে। সবাই তা হলে ধর্মঘট চালাতে আরো কোমর বেঁধে লাগবে। কিন্তু পৌঁছতে হোলো না। তার আগেই ভাড়াটে গুণ্ডার প্রচণ্ড লাঠির ঘায়ে আমি আর সন্তোষ একটা পোড়ো জমির মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। খুব সংক্ষেপে বলছি, অজয়—যখন জ্ঞান হোলো দেখি সে-রাতেও এমনি চাঁদ উঠছে আর সন্তোষ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার ঠোঁট ঠেকেছে আমার কপালে। ব্যস্ত হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম বাধা দিয়ে সন্তোষ বললো, 'এখন উঠো না। আর একটু শুয়ে থাকো। এখনো তুমি দুর্বল।' কিন্তু উঠে আমি বসলুম আর বললুম, 'এখনো গুণ্ডার কবল থেকে উদ্ধার

পাইনি দেখছি। ছিঃ সন্তোষ!' ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেলো। উঠে দাঁড়ালো। আমিও দাঁড়ালুম। পা চলতে চায় না। তবু চললুম। বস্তিতে পৌঁছে সবাইকে খবর জানালুম। আমাদের দু-জনের নামে তারা জয়ধ্বনি করলো। তারপর আবার একসঙ্গে ফিরলুম বাড়ি। কোনো কথা হোলো না। পরের দিন সন্তোষের দেখা পেলুম না। তারপরের দিনও না। তারপরের দিন খবর পেলুম: এই শিমুলতলার রেলের লাইনে সন্তোষের বাঁকাচোরা কাটাছেঁড়া দেহটা পাওয়া গেছে।"

এতো সহজে কথাগুলো শুভ্রা বললো যে শুনলে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই ঠাণ্ডা শাদা জ্যোৎস্নায় অজয় দেখলো তার চুলগুলো যেন আরো রুক্ষ আর এলোমেলো হয়ে গেছে আর তার শাদা রক্তহীন মুখ যেন আরো শাদা দেখাচ্ছে। শুভ্রা থামতেই সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ যেন জনশূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করতে লাগলো আর চাঁদের আলো হঠাৎ যেন কঙ্কালের মতো হেসে উঠলো।

"কী অজয়! এ-রকম ভালোবাসতে পারবে?" কিন্তু শুভ্রার সুরে কোনো রকম ব্যাঙ্গ নেই। যেন 'অনেক রাত হোলো এবার বাড়ি ফেরা যাক'—এই রকম সুরেই কথাগুলো বললো।

অজয় কী যেন বলতে চেষ্টা করলো। বাধা দিয়ে উঠলো শুভ্রা, "না-না, কোনো কথা বোলো না। তোমাকে ঠাট্টা করবো

বলে এ-প্রশ্ন করিনি। আমি জানি সন্তোষের মতো ভালোবাসতে সন্তোষ ছাড়া আর কেউ পারে না।—কিন্তু ভালোবাসার কথাটা যাক। বলতে ভালো লাগে না।—তারপর থেকে কী হোলো শোনো। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলুম। বেঁচে রইলুম সত্যি, কিন্তু সে-রকম কেউ যেন না বাঁচে! কোনো কাজ করতে পারি না। কোনো কাজে আনন্দ পাই না। কোনো কল্পনাতেও আনন্দ পাই না। উঠেপড়ে মজুরদের মধ্যে জোর করে কিছুদিন কাজ করলুম। কিন্তু শিগগীরই বুঝলুম খাটবার শক্তি আমার গেছে। ডাক্তার বললো লম্বা বিশ্রাম নিতে। এক বছর চুপচাপ রইলুম। তারপর যখন ফের কাজ করতে ফিরলুম দেখি আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছি! এক সঙ্গে গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারি না। এক সঙ্গে কোনো রকম শারীরিক পরিশ্রম তো নয়ই। ডাক্তার বলছে নার্ভস্ খারাপ হয়ে গেছে। কোনো রকম কাজেরই আমি আর যোগ্য নই। এ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ লাইনে যেতে হবে। মানে, যতদিন বাঁচবো ততদিন শুধু গুনবো জীবন থেকে একটি-একটি করে দিন কমে-কমে যাচ্ছে। বলো অজয়, এ-রকম জীবনের কোনো মানে আছে?"

এই প্রথম শুভ্রার স্বরে একটি বিষণ্ণ-ম্লান সুর লাগলো।

"কোথাও টিঁকতে পারি না। কাজ করবার শক্তি নেই তবু সমস্ত শরীর আর মনে একটা ছটফটানি আছে। খুব

অসহ্য হলে এখানে একাই চলে আসি আর চুপচাপ এই রেল লাইনের দিকে চেয়ে থাকি। কত জ্যোৎস্নার সমস্ত রাতই কেটে গেছে এই রেল লাইনগুলো দেখে! মনে হয় অনেক দিনের চেনা লোক অনেক দূরে চলে গেছে এই ইস্পাতের পাতের ওপর দিয়ে। আমি চেয়ে থাকি আর ভাবি—সত্যি, অজয়, এতো গভীর ভাবে ভাবি—এই লাইনের ওপর দিয়ে আবার হয়তো সে ফিরে আসবে। ছিপছিপে, লম্বা, মুখে বসন্তের দাগ, সেই কালো রঙের ছেলেটি।"

শুভ্রা চুপ করতে হঠাৎ যেন এই নির্জন জায়গার ঝিঁঝিঁ-গুলোও ডাকা বন্ধ করলো। আর এমন একটি নির্জনতায় অজয় আচ্ছন্ন হোলো যাকে ছোঁয়া যায়। তার বুকের ভিতরে রক্ত দ্রুত চলতে সুরু করেছে। তার হৃদপিণ্ডের শব্দটাও যেন পাথর থেকে পাথরে প্রতিধ্বনিত হবে।

"রূপোর পাতের মতো এই রেল লাইনের দিকে রাত্রে চেয়ে থাকতে-থাকতে যেন নেশা ধরে যায়। মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি আমি নেই, তুমি নেই, সন্তোষ নেই—কোনো জীবন নেই, যৌবন নেই, জ্ঞান নেই—শুধু রূপোর মতো চকচকে আর সাপের মতো ঠাণ্ডা আর জ্যোৎস্নার মতো মসৃণ দুটি ইস্পাতের লাইন আছে—যার ওপর দিয়ে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন একদিন বহুদূরে চলে যায়, আর ফেরে না। চেয়ে থাকতে-থাকতে ঘুম পায়, অথচ ঘুমুতে পারো না। যেন নেশা

ধরে! একবার এই রকম ঘুমঘুম নেশা ধরা-ধরা চোখে কী দেখেছিলুম জানো?—"

অজয় শুধু তার বোবা চোখ তুলে চাইলো। কথা বললো না।

"দেখলুম অনেক-অনেক দূরে এই ইস্পাতের পাতের ওপর দিয়ে একটি ছিপছিপে ছায়ামূর্তি যেন হেঁটে আসছে। স্পষ্ট তার মুখ দেখা যায় না অথচ শপথ করে বলতে পারি তার কালো মুখের ওপরকার বসন্তের দাগ আমি স্পষ্ট দেখেছিলুম। আমি উঠতে পারলুম না, নড়তে পারলুম না, চোখ বন্ধ করতে পারলুম না। শুধু চেয়ে রইলুম, আর সেই ছায়ামূর্তি ক্রমশ টলতে-টলতে এগিয়ে আসতে লাগলো। তারপর হঠাৎ যেন ঝড় উঠলো! কালো বিরাট একটা দৈত্যের মতো ইঞ্জিন, তার সার্চ-লাইটের চোখটা লোলুপ, ক্ষুধার্ত, তীক্ষ্ণ—ঝড়ের মতো এগিয়ে আসতে লাগলো। রাত্রির বুক চিরে ইঞ্জিনের বাঁশি বাজলো, প্রতি মুহূর্তে সেই ছায়ামূর্তি আর ইঞ্জিনের ব্যবধান এলো কমে। কিন্তু সে সরলো তো না-ই, এমন কি চোখ তুলে পর্যন্ত চাইলো না! মাথা নীচু করে লাইনের ওপর দিয়ে যেমন এগিয়ে আসছিলো তেমনি আসতে লাগলো। আর তারপর, তারপর—ওই দেখো অজয়...."

চমকে অজয় চোখ তুলে শুভ্রার ডান-হাতের আঙুল অনুসরণ করে দেখলো দূরের বাঁকে ছোট্ট বিন্দুর মতো একটি আলো

কাঁপছে। যেন কাঁছপোকার একটি গোল টিপের উপর জ্যোৎস্না ঝকঝক করছে। দেখতে-দেখতে সেখানকার নির্জনতা ইস্পাতের ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠলো, সেই বিন্দুব মতো আলোর পরিমাণ বড় হতে লাগলো, তারপর ট্রেন আর কালো ইঞ্জিনটাকে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা গেলো। হঠাৎ যেন নির্জন অরণ্য ফুঁড়ে একটা অজগর এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে।

"দেখো অজয়," উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই কঙ্কাল জ্যোৎস্নায় শুভ্রা উঠে দাঁড়ালো—মোষের পিঠের মতো কালো পাথরের ভিতর থেকে যেন একটি ক্ষীণ গাছ উঠেছে, আসন্ন ঝড়ের আবেগে থরথর করছে। "দেখো অজয়,—এই সেই ট্রেন। সামনেই চকচক করছে ইস্পাতের লাইন, পারো আমার জন্যে এই ইস্পাতের লাইনের ওপর শুয়ে থাকতে?"

"শুভ্রা— ?"

"পারো, অজয়?" ততক্ষণে ট্রেনটা বেশ কাছে এসে পড়েছে। ইস্পাতের লাইন দুটো থরথর করে কাঁপছে, শুভ্রার গলার স্বরও তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। "পারো, অজয়? ভেবে দেখো পারো কি?" তারপর সেই ধাতব উচ্চকণ্ঠে শুভ্রা দুলে দুলে লাগলো হাসতে। এতো বড় কৌতুকের মুখোমুখি সে যেন কখনো হয়নি! বিস্ফারিত চোখে অজয় শুধু দেখতে লাগলো।

"কিন্তু কোন দুঃখে তুমি ইস্পাতের লাইনে শোবে, অজয়? সত্যিই তো জীবনে তোমার আসল দুঃখ কিছুই নেই! অনেক টাকা, অনেক প্রতিষ্ঠা। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দরী স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে— বাস্তবিক তোমার ছেলেমেয়েদের একবার দেখতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু আর কখনো হবে না বোধ হয়।—যাক্। কিন্তু দেখো দিকিনি, কী চমৎকার দেখতে লাগছে ইঞ্জিনটাকে— মানুষে বানিয়েছে, অথচ মানুষের চেয়ে কত বেশি তার শক্তি! তোমার ভয় করে না, অজয়? আমার করতো, এখন আর করে না! আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ট্রেন পার হয়ে গেছে। ইঞ্জিনকে আমার ভয় নেই—"

বলে উঁচু পাথরটা থেকে ঝুপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো শুভ্রা, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনের উপর পৌঁছে দৌড়তে লাগলো ট্রেনের দিকে! যেন ঝড়ের সামনে উড়ে চলেছে শুকনো শাদা একটা পাতা। তার শাড়ির আঁচল উড়ছে, তাব রুক্ষ চুল উড়ছে—আর কালো অজগরের মতো মাথায় মণি জ্বালিয়ে ছুটে আসছে ইঞ্জিন।

উত্তেজনার বিহ্বলতায় অজয় উঠে পর্যন্ত দাঁড়াতে পারলো না। যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো—পাথরের উপর আর একটি পাথরের মতো।

ট্রেন চলে গেলো। লাইনের পাশের বুনো গাছের এক ঝোপের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিলো শুভ্রা। উত্তেজনায় তখনো

হাঁপাচ্ছে। পাথরের ধাক্কা লেগে পায়ের একটা আঙুল থেঁৎলে গেছে। ইঞ্জিনের ফানেল থেকে খুব ছোট্ট এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা তার বাঁ হাতের উপর পড়ে জ্বলতে-জ্বলতে নিজে থেকেই নিভে গেছে। ঠিক সময়ে সে লাফ দিয়ে পড়তে পেরেছিলো। নইলে সত্যিসত্যি তার গায়ের উপর দিয়ে ইঞ্জিনটা চলে যেতো আর একটু হলেই! ট্রেনের ঝড়ে তার শাড়ি আর পেটিকোট উড়ে হাঁটুর উপর উঠেছে। কাপড়টা ঠিক না করেই শুভ্রা অল্পঅল্প হাসতে লাগলো। খুব লাগসই করে সন্তোষের গল্পটা সে বলতে পেরেছে—তার শোনা একটা গল্প! তার শুকনো নিস্ফল জীবনের এই সামান্য প্রতিহিংসাটুকু সে নিতে পারুক অজয়ের উপর—অজয় অন্তত সত্যিসত্যি ভাবুক শুভ্রা তাকে চিরকালের মতো ভুলে গেছে, শুভ্রার জীবন থেকে অজয় গেছে মরে। কিন্তু আর একটু হলে কী কাণ্ডটাই না হতো—যাই বলো চমৎকার একটা থ্রিল পাওয়া গেলো আজ!— ভারি ভালো লাগে তার খুব ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পার হতে, চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামতে, ডিকেটটিভ বই পড়তে, হাইস্টেকে ফ্লাশ খেলতে। আজকের খেলাটাই কিন্তু সবচেয়ে রোমাঞ্চকর হয়েছে তার জীবনে।

ট্রেনের শব্দ তখন দূরে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সেই ঝড়ের চিহ্নমাত্রও নেই। ইস্পাতের লাইনগুলো জ্যোৎস্নায় রূপো হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো শুভ্রা। তার

রুক্ষ চুলগুলো দু-হাত দিয়ে একবার ঠিক করে নিলো। তারপর লাইন পেরিয়ে সেই কালো পাথরে ফিরে এলো। রীতিমতো দুর্বল লাগছে তার এইটুকু পথ হেঁটে আসতে।

সেই কালো পাথরের উপর অজয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, শাদা জ্যোৎস্না সেই মুখের উপর পড়েছে। ভারি বোকা-বোকা দেখাচ্ছে অজয়কে! একবার তার পাশে বসে খুব আলগোছে তার নাড়ীর স্পন্দন শুভ্রা অনুভব করলো। না, ভয় নেই। কিছু পরেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে। কী মনে হওয়ায় তার কপালের খুব কাছে মুখটা আনলো শুভ্রা। কী মনে করে আবার সে সরে এলো। ফ্লাস্কের ঢাকা খুলে অনেকটা গরম কফি খেলো, অজয়ের পকেট থেকে সেই দামী ইজিপশিয়ান সিগারেট বার করে ধরালো, তারপর সেই কালো পাহাড়টার পাশাপাশি চুড়ো দুটোর দিকে চাইতে চাইতে তার মনে হোলো একদিন তারও যৌবন ছিলো!

ভস্ম

লোকটার জরাজীর্ণ চেহারা : গাল চুপসনো, কপালের উপর নানা রেখা বাঁ থেকে ডান পাশে এবং উপর থেকে নীচে নেমেছে, গভীর হয়েই নেমেছে। চোখের তলায় কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। সমস্ত মুখ বসন্তের দাগে ক্ষত-বিক্ষত। তবু অসাধারণ ধূর্ত তার চোখের দৃষ্টি। জীবনের অনেক কালি আর যৌবনের অনেক উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ রয়েছে সেখানে।

কিন্তু আমার মনে অন্য নানা কথা এমন বিভিন্ন ঢেউ তুলছিলো যে লোকটার দিকে বেশিক্ষণ মন দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমার উল্টো দিকের বেঞ্চিতে সে বসে। নানা ভাবনার ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার তার দিকে চোখ পড়ছিলো। তার উপস্থিতি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। কাঁটার মতো ক্রমাগত যেন বিঁধছিলো।

আমি ডাক্তার। ফুসফুস নিয়ে আমার কারবার। অনেক মৃত্যুর শিয়রে আমার সময় কেটেছে। তাই, কোনো বিশেষ মৃত্যু এতো দিন স্পর্শ করতে পারেনি। আজ কিন্তু পেরেছে।

সামনের বেঞ্চির লোকটাকে মন থেকে কিছুতে মুছে ফেলতে পারছি না দেখে নিজের উপরেই বেশি রাগ হোলো। বিরক্তি সত্ত্বেও লক্ষ্য করতে লাগলুম লোকটার চুলগুলো শাদা

হয়ে গেছে। গলার কাছের মাংসগুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। দাঁতগুলো অপরিষ্কার। পরনের স্যুটটা যেমন জীর্ণ তেমনি ময়লা।

তার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে-না-নিতেই লোকটা এবার ইংরিজিতে আমাকে প্রশ্ন করলো, "ক্ষমা করবেন! কিন্তু আপনি কি আগ্রায় চলেছেন?"

অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন চমকে উঠলুম। ট্রেনের বাইরে অপরূপ সূর্যাস্ত হচ্ছে, রঙীন ওড়নার মতো পাতলা একটি মেঘ সূর্যাস্ত-আকাশের উপর অলস হয়ে শুয়ে রয়েছে। সেই পড়ন্ত বেলা, ডুবন্ত সূর্য আর রঙীন মেঘের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ রেখে, ট্রেনের ঘটঘট ঝনঝন শব্দের তাল শুনতে-শুনতে আমার একমাত্র বন্ধু জয়ন্ত'র মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সিমলার স্যানেটোরিয়ামে বহু দিন জয়ন্ত ছিলো। শীতকালে দিল্লিতে নেমে আসতো। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি—এই তিন মাস দিল্লিতে সে থাকতো। মার্চের গোড়ায় আবার হাজির হোতো সিমলার স্যানেটোরিয়ামে। গত বছর দশেক এইভাবে সে কাটিয়েছে। এবারের ডিসেম্বরেও সে দিল্লিতে নেমে এসেছিলো। কিন্তু নূতন বছরের মার্চ মাসে আর সে উঠে যাবে না। তার চিতার ছাই এ-কদিনে নিশ্চয়ই বাতাসে মিশে এসেছে। সিমলার চেয়ে আরো অনেক উঁচুতেই হয়তো তা উঠবে।

সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জয়ন্তর মুখটাও মুছে গেলো। লোকটার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি, সে-কথাটা ইতিমধ্যে কখন আবার ভুলে গিয়ে জয়ন্ত'র কথাই ভাবছিলুম। সে জীবনে আগ্রায় যায়নি, তাজমহল দেখেনি ! প্রেমই বল আর তাজমহলই বল—আমাকে কোনোটাই কোনো দিন আকর্ষণ করেনি। এ-পথে আমিও কতবার যাতায়াত করেছি, রোগী দেখতেও বারকয়েক কয়েক ঘণ্টার জন্য আগ্রাতেও আসতে হয়েছে—কিন্তু তাজমহল দেখা হয়ে ওঠেনি। আমাদের দু'জনের এই তাজমহল না দেখার কারণটা যদিও এক নয় তবু এ নিয়ে কোনো দিনও আমরা কোনো আলোচনায় নামিনি।

শীতের সূর্যাস্তের পর ট্রেনের নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির মাঝখানে বেলা-শেষের যেটুকু আলো বাকি ছিলো আমাদের কামরায় কোনো রকমে তা ঢুকে একটি বিষণ্ণ সুরে যেন আচ্ছন্ন করেছিলো। লোকটা হঠাৎ সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে চটপট নিজের দিকের শার্সি তুলে যেন বিশ্রী একটা ছন্দপতন করলো। বিরক্ত হয়ে চোখ তুলতেই তার কুৎসিত মুখ হাসিতে ভরিয়ে আবার সেই পুরনো প্রশ্নের আবৃত্তি সে করলো, "ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি কি আগ্রায় চলেছেন ?"

আমি অত্যন্তই কাটখোট্টা মানুষ। বাজারে আমার দুর্নাম আছে বদরাগী আর দুর্মুখ বলে। বেশ রূঢ় স্বরেই

জবাব দিলুম, “আমি আগ্রায় যাচ্ছি কিনা এই খবরে আপনার কী যায় আসে জানতে পারি কি ?”

আমার প্রশ্নের পিঠে-পিঠেই লোকটা উত্তর দিলো, “নিশ্চয়ই ! আমি সেখানকার গাইড কিনা। আমাকে নিযুক্ত করলে আপনার সব রকম সুখ-সুবিধের ভার আমার। হোটেলের বন্দোবস্ত থেকে তাজমহল দেখানো, এমন কি ফিরতি-পথের টিকিট আর রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা থেকে ট্রেনে জিনিসপত্র তুলে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বটাই আমার।”

লোকটার কথা শুনে বললুম, “ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কোনো গাইডের দরকার নেই, যদিও আগ্রাতেই যাচ্ছি।”

নাছোড়বান্দা আধবুড়ো আবার কী যেন বলতে গেলো। হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বললুম, “ও প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়েছে বলে মনে করি।”

আর কোনো কথা সে বললো না। পকেট থেকে একটা আধপোড়া চুরুট বার করে ধরালো। আমিও মুখ ফিরিয়ে বাইরের ধূসর গোধূলির দিকে চেয়ে রইলুম। এখানকার শীতের শুকনো মাটি ধুলোয় আচ্ছন্ন। মাঠের ঘাসগুলো অধিকাংশ স্থানেই নেই। ঠাণ্ডা বাতাস আর ধুলো পাশের জানালা দিয়ে কামরার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। ইতিপূর্বে, ভালো করে ভেবে দেখলুম, প্রায় এগারো বছর আগে শেষবার আগ্রাতে এসেছি। আগেই উল্লেখ করেছি—তাজমহল দেখতে নয়,

রোগী দেখতে। ভাবতে চেষ্টা করলুম তখন এই আধবুড়ো জরাজীর্ণ গাইডের সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম কিনা। অনেক ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারলুম না। হয়তো এই গাইডের পাল্লাতেই পড়েছিলুম। কিন্তু এগারো বছর আগে তার স্যুট হয়তো নতুন ছিলো, বার্ধক্যের মেটে রঙ হয়তো তার শরীরে আজকের মতো লেগে যায়নি। তাই আজ এগারো বছর পরে তাকে চিনবো কী করে?

বাইরের রুক্ষ পৃথিবী দ্রুত অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেনের মতোই দৌড়ে অন্ধকারের জোয়ার আসছে যেন। শীতের স্বচ্ছ আকাশের রঙ ঘন নীল থেকে ক্রমশ কালো হয়ে গেলো। তারপর কয়েকটি স্বচ্ছ তারা যেন ঢাকনা খুলে এলো বেরিয়ে। জয়ন্ত'র চোখের সঙ্গে সেই চকচকে তারাগুলোর আশ্চর্য মিল আছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার অসুস্থ দেহের মধ্যে ওই চোখ দুটোই উজ্জ্বল হয়ে ছিলো। পৃথিবী-টাকে আজ বড় বেশি ঠাণ্ডা আর শূন্য বলে মনে হতে লাগলো।

আজ এতো বছর পরে কেন আগ্রায় চলেছি নিজেই ঠিক জানি না। কলকাতায় আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। অনেক রোগীর আত্মীয়স্বজন ব্যস্ত হয়ে আমার অপেক্ষায় যে রয়েছে সে-কথাও জানি। কিন্তু এবার দিল্লি ছাড়বার আগে মনে হলো জয়ন্তকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলেছি। সমস্ত

ব্যাপারটাই এতো বিস্বাদ লাগছিলো যে বলবার নয়। আজীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যে কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম নিজেই আগে বুঝিনি! তাই দিল্লি থেকে চলে আসার আগেই হঠাৎ ঠিক করলুম কিছুদিন বিশ্রাম করে যাবো। আগ্রার কথা মনে হোলো। এক সপ্তাহ সেখানে মন্দ কাটবে না; অন্তত পরিচিত লোক কেউ নেই বলে মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কোনো হোটেলে থাকতে পারবো মনে হয়েছিলো। কিন্তু টুণ্ডলায় গাড়ি বদল করে আগ্রার যত কাছে আসতে লাগলুম ততই একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি হতে লাগলো। আকাশের তারাগুলো জয়ন্ত'র অসুস্থ চোখের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ভালো লাগছে না। তার সমস্ত জীবনটা কী ভাবে যে নষ্ট হোলো, কারুর কোনো কাজেই যে লাগলো না আজ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে সে-কথা অনুভব করলুম।

কোন হোটেলে উঠবো আগে থেকেই জানা ছিলো। আগ্রায় পৌঁছে টাঙায় উঠে মাথার টুপি কপালের উপর নামিয়ে ওভারকোটের কলার উলটে যখন বসেছি, দেখলুম সেই গাইডও আমার আগের টাঙায় উঠেছে। তার পাশের লোকটিকে দেখে বুঝলুম এই অল্প সময়ের মধ্যেই আর একটি যাত্রী ধরা তার পক্ষে কঠিন হয়নি। লোকটার মুখে সেই চুরুটটা এখনো নেভেনি। রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে কড়া চুরুটের গন্ধটা মন্দ লাগছে না।

কী আশ্চর্য। নিজের পাইপটার কথা ভুলেই গেছি যে! বুক-পকেট থেকে পাইপ আর পাশের পকেট থেকে তামাকের পাউচ বার করলুম। টাঙা চলতে শুরু করলো। ঝুনঝুন করে ঘোড়ার গলার ঘণ্টাগুলো বাজছে। পরিচিত তামাকের গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে! পাইপের লালচে আলোয় হাতঘড়িটা চোখের কাছে তুলে দেখলুম: প্রায় আটটা। আজ রাত্রে চাঁদ উঠবে কি? কে জানে এটা কোন পক্ষ? মনে পড়লো প্রথম জীবনে আমরা তিনজন মধ্য-প্রদেশের সেই নির্জন খিণ্ডসি লেকের ছোট্ট পাহাড়টার উপরকার ডাক-বাংলোয় অন্ধকারে বসে পাইপের লালচে আলোয় হাতঘড়ি দেখেছিলুম আর সুনন্দা তার সেই আশ্চর্য স্বরে প্রশ্ন করেছিলো, "কিন্তু আজ কি চাঁদ উঠবে?"

আমি হেসে জয়ন্ত'র স্ত্রীকে বলেছিলুম, "উঠবে মানে? চাঁদ তো উঠেই রয়েছে!"

অন্ধকারে তার বড়বড় চোখের বিস্মিত দৃষ্টি দেখা যায়নি সত্যি কিন্তু অনুভব করেছিলুম। রাত্রির নির্জনতায় শুধু ঝিঁঝিঁ গুলো ডাকছিলো। খানিক নীচেকার হ্রদের ছোটো-ছোটো ঢেউ-এর অস্পষ্ট মর্মর আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম। সুনন্দা তার অপূর্ব স্বরে বিস্ময় মিশিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, "কই? কোথায় চাঁদ উঠেছে?"

আমি বলেছিলুম, "চাঁদের দুর্ভাগ্য নিজেকে সে দেখতে পায় না!"

প্রশংসা শুনতে ভারি ভালোবাসতো সুনন্দা। ভারি খুসি হয়েছিলো।

ঝুনঝুন শব্দে শীতের রাত্রি ভেদ করে টাঙাটা ছুটে চলেছে। কে জানে আজ চাঁদ উঠবে কিনা। ···কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সেই নির্জন হ্রদের উপর সে-রাত্রে চাঁদ উঠেছিলো। সমস্ত আকাশ আর জল জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গিয়েছিলো। আর মাঝে-মাঝে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করে সুনন্দার হাসি হ্রদের মর্মরের সঙ্গে মিশেছিলো।

আগ্রায় এসে আজ সুনন্দার কথা বেশি করে মনে পড়ার কারণ জানবার জন্য নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলুম। পৃথিবীতে আজ সে জয়ন্ত নেই, আমার সেই যৌবন নেই—আর সুনন্দা? কিন্তু তার কথা থাক—। শুধু মনে পড়ছে মধ্যপ্রদেশের সেই নির্জন রাত্রে জয়ন্ত'র সে প্রস্তাব: "এর পর আমরা তিনজনে কিন্তু চাঁদের আলোয় একবার তাজমহল দেখতে যাবো। কেমন, যাবি তো?"

আজ কত বছর পরে আগ্রায় এসে জয়ন্ত'র কথাগুলো মনে পড়লো। সে-রাত্রে কী উত্তর দিয়েছিলুম আজ মনে নেই। প্রথম যৌবনের ধর্মই হচ্ছে হ্যাঁ বলা। সম্ভবত হ্যাঁ-ই বলেছিলুম। কিন্তু তারপরেই আমাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছিলো। ইংলণ্ডে ডাক্তারি পড়া শেষ করে য়ুরোপের নানা হাসপাতাল ঘুরে ভারতবর্ষে যখন ফিরে এলুম সে আজ যোলো-সতেরো

বছর আগেকার কথা।···ছ' বছর পরে দেশে ফিরলুম। জয়ন্ত'র সঙ্গে দেখা হোলো। ইতিমধ্যে কী যে ঘটে গিয়েছে জানতুম। তবু জয়ন্তকে দেখে চমকে না উঠে পারিনি। তার সেই উজ্জ্বল রঙ যেন পুড়ে গেছে, তার চোখের তলায় কালো গর্ত, সামনের দিকের চুল প্রায় উঠে এসেছে। অনেক কথা হয়েছিলো মনে আছে, ছ' বছরের পুঞ্জীভূত গল্প এক দিনে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে একটি প্রসঙ্গ দুজনেই আমরা এড়িয়ে গিয়েছিলুম যদিও সেই প্রসঙ্গই আমাদের মনের একেবারে ধারে এসে বরাবর দাঁড়িয়েছিলো।

হাতের পাইপটা নিভে গেছে। কতক্ষণ নিভেছে জানি না। টাঙা হোটেলে এসে থামতে যেন চমক ভাঙলো। পুরোনো দিনের ভূতকে বিশ্বাস নেই! একবার ঘাড়ে চাপলে নামানো কঠিন।

ক্ষিদে মন্দ পায়নি। খাওয়ার পর্ব শেষ করে পাইপ ধরিয়ে হোটেলের নির্জন বারান্দায় এসে বসার পর আগ্রার শেষ-ডিসেম্বরের শীতের তীক্ষ্ণতা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছি। ওভারকোট চাপাতে পারলে মন্দ হোতো না। পাইপ ধরিয়ে সবে সামনের বেতের চেয়ারে পা-দুটো তুলতে যাচ্ছি এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার এসে প্রশ্ন করলেন, "আজকেই তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন নাকি?"

তাঁর প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলুম না। তিনি

বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুল অনুসরণ করে সামনের তেঁতুল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলুম ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে। তিনি জানালেন এ-বছর এ-সময়টা প্রায়ই মেঘলা হয়ে থাকছে। রাত্রে একদিনও পরিষ্কার আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। আমার কপাল ভালো, আজ চাঁদকে পেয়েছি। কাল থেকে আবার হয়তো মেঘলা করে থাকবে। এ-সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না : চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখার সৌভাগ্য।

আজ সন্ধেয় ট্রেন-থেকে-দেখা উজ্জ্বল তারার মতো জয়ন্ত'র চোখ দুটো হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেলো : তার অসুস্থ মুখের উজ্জ্বল চোখ। মনে পড়ে গেলো বিদেশ থেকে ফেরবার পর একদিন বিকেলে চা পান শেষ করে জয়ন্ত নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে বলেছিলো, "এ-জীবনে চাঁদের আলোয় আর তাজমহল দেখা হোলো না।" তারপরেই মনে হোলো পুরোনো দিনের ভূতকে ঘাড় থেকে না নামাতে পারলে রাত্রে ঘুমোনো কঠিন। খোলা হাওয়ায় খানিক বেড়ানো মন্দ হবে না। জয়ন্ত এ-পৃথিবীতে আর নেই। চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখলে কারুরই আজ কিছু যাবে আসবে না।

সমস্ত শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষ-ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় তাজমহলের নিস্তব্ধতাও জমাট বেঁধেছে বলে মনে হোলো। চাঁদটা আরো খানিক উপরে উঠেছে। উদ্যানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অন্ধকারের বুকে ফুলের মতো ফুটে

রয়েছে যেন। সির-সির করে বাতাস বইছে। গরম জামার ভিতরেও খুব আরাম পাচ্ছি না। আজকের রাতে চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখতে আসার মতো খেয়ালী মানুষ আর কেউ আছে বলে জানা ছিলো না। কিন্তু তাজমহলের বিরাট ফটকের কাছে তিন-চারটে টাঙা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার সে-ভুল ভাঙলো।

ফটক পার হবার সময়েই জয়ন্ত'র সেই কথাগুলো আবার মনে পড়লো : এ-জীবনে চাঁদের আলোয় আর তাজমহল দেখা হবে না। তারপর শিশির-ভেজা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে আমাদের বিগত জীবনের আরো নানা খাপছাড়া কথা মনে পড়তে লাগলো। গাছের তলাকার অন্ধকারের বুকে জ্যোৎস্নার ছোটো-ছোটো ফুলের মতো সেই সব স্মৃতি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি আর উত্তেজনায় ক্রমশ সমস্ত মন যেন ভারি হয়ে উঠলো। এ-সময়ে হঠাৎ যদি জয়ন্ত'র সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

ঘুরে বেড়াতে আর ইচ্ছে হোলো না। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে একটি বেঞ্চির উপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ততক্ষণে রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দূরে সাদা পাথরের তাজমহলটা ভারি হালকা আর ভঙ্গুর বলে মনে হয়। স্পষ্ট অথচ স্পষ্ট নয়। সত্যি অথচ যেন সত্যি নয়। মনে হয় যেন জোরে বাতাস বইলে সাবানের ফেনার মতো অবলীলাক্রমে সাদা পাথরের এই মায়া উড়ে যাবে।

দেখতে-দেখতে যেন নেশা ধরে গেলো। পুরোনো দিনের ভূতকে বুঝি ঘাড় থেকে আর নামাতে পারলুম না। দলে-দলে ভিড় করে তারা ভেসে আসতে লাগলো। কত বিকেল আর সন্ধের সেই সব উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি। কত ভালো-লাগা, কত ভালোবাসা। কত কামনা, বাসনা। শেষ কোথায়? তাদের শেষে কী আছে? কী আছে শেষে?

বিদেশ থেকে ফিরে জয়ন্তকে দেখে মনে হয়েছিলো এ-ধাক্কা একদিন'সে কাটিয়ে উঠবেই। সময়ই সব চেয়ে বড় সার্জেন। যে-কোনো ক্ষতকে সে আরোগ্য করতে পারে, পারে সম্পূর্ণ সারিয়ে দিতে। হয়তো ক্ষতের চিহ্ন সামান্য থাকে, কিন্তু ব্যথা থাকে না। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কিন্তু আমার ভুল বুঝতে পারলুম। চোখের সামনে জয়ন্ত'র সমস্ত শরীরটা যেন ভেঙে-ভেঙে পড়তে লাগলো। আর যেদিন জয়ন্তকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললুম, আর ছেলেখেলা নয়, অসুখটা জাঁকালো হয়ে বসেছে, রীতিমতো চিকিৎসার জন্যে তাকে সিমলার স্যানেটোরিয়ামে যেতে হবে—সেই দিন আবার জয়ন্ত'র মুখে ফিকে হাসি দেখতে পেয়েছিলুম। খুব রাগ হয়েছিলো সেদিন। এ-রকম ইচ্ছে করে শরীর নষ্ট করার অধিকার কারুর নেই। জয়ন্তকে বেশ কড়া কথাই বলেছিলুম। কিন্তু সে যেন একটা কিসের ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিলো। আমার কথা শুনে সে সিমলার

স্যানেটোরিয়ামে চলে গেলো সত্যি, তবে সে বুঝেছিলো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার দিন তার এগিয়েই এসেছে। আর সে-কথাটা বুঝেছিলো বলেই যেতে সে বিশেষ আপত্তি করেনি। —এ-রকম আশ্চর্য ঘটনা কখনো আমি আগে কল্পনাও করতে পারিনি। কারুর অভাবে এতো বড় এতো বিচিত্র পৃথিবী যে একেবারে নিরর্থক হয়ে যেতে পারে, জয়ন্তকে দেখার আগে সে-কথা আমার কল্পনাতেও ছিলো না।

সামনের চাঁদের আলোয় তিনটি ছায়া-মূর্তির মতো মানুষ ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে দেখলুম। হাঁটার ভঙ্গী দেখে বুঝতে অসুবিধে হোলো না যে তাদের মাঝখানেরটি স্ত্রী-লোক, দু'পাশের দু'জন পুরুষ। আমি যেখানে বসে, তার সামনে দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে সোজা তাজমহলের দিকে চলে গেছে। সেই বাঁকের কাছাকাছি এসে তিনজনে থামলো। সেই দুজন পুরুষের মধ্যে একজন হাতের ছড়িটা তুলে দূরের তাজ-মহলের দিকে বার কয়েক নাড়ালো। তারপর যে লোকটি ছড়ি নাড়াচ্ছিলো সে অলস পদক্ষেপে মাটির দিকে মুখ করে আমারই বেঞ্চির দিকে এগিয়ে এলো। অন্য দুজন এগিয়ে গেলো তাজমহলের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটি এসে আমারই বেঞ্চিতে ঝুপ করে বসে পড়লো, আর তারপরেই কড়া দেশী মদের একটা পচা গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস ভারি হয়ে উঠলো।

এই মত্ত অবস্থায় রাস্তার ওই বাঁক থেকে অন্ধকারের ভিতর এই বেঞ্চিটি ঠাহর করে দেখা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই সম্ভব নয়, মত্ত অবস্থার কথা তো ছেড়েই দিলুম। তাই লোকটিকে এই বেঞ্চিতে এসে বসতে দেখে অনুমান করলুম সে এখানকারই লোক, নইলে এ-রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সম্ভব নয়।

সামনের সেই স্ত্রী আর পুরুষ মূর্তিটি ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের কালো গরম জামাগুলো এই চাঁদের আলোয় দুটি বিন্দু বলে মনে হয়। খুব ধীরে-ধীরে তারা পথ চলেছে বলে মনে হোলো। পাশের মাতালের দুর্গন্ধের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পাইপটা আবার ভালো করে ধরালুম। দেশলাইটা পকেটে রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় সেই মাতাল পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে দাঁতে কামড়ে আমার কাছ থেকে দেশলাইটা ধার চাইলো। স্বর শুনেই চিনেছিলুম, দেশলাইটা জ্বালতেই নিঃসন্দেহ হলুম। লোকটা আর কেউ নয়, সেই ট্রেনে-দেখা গাইড।

বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বুকের উপর মাথাটা ঝুলিয়ে লোকটা চুরুটে বার কয়েক জোরে টান দিলো। চুরুটের সেই লালচে আলোয় দেখলুম লোকটার চোখ দুটো বুজে এসেছে। চোখ বুজে এলেও এবং নেশার ঘোর লাগলেও লোকটা যে একেবারে বেহুঁস হয়নি তার প্রমাণ পেলুম : সেই অবস্থাতেই বসে লোকটা

তার বাঁ হাত প্রসারিত করে আমাকে দেশলাইটা ফেরৎ দিলো।

খানিক চুপচাপ। শীতটা অসহ্য লাগছে। তাছাড়া মাতালের সঙ্গ ভালো লাগছিলো না। ভাবছিলুম এ-জায়গা ছেড়ে উঠে আরো খানিক কাছ থেকে তাজমহল দেখে হোটেলে ফেরবার কথা। ঠিক সেই মুহূর্তেই বেশ জড়ানো গলায় লোকটা ইংরিজিতে প্রশ্ন করলো, "আপনি কি ট্যুরিস্ট ?"

কথা না বাড়াবার জন্যে বললুম, "হ্যাঁ।"

"আপনি কি একা এসেছেন ?"

আবার উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ।"

লোকটা একটুও না নড়ে জড়ানো গলায় শুধু একবার চুকচুক করে শব্দ করলো। খুব সম্ভব আমাকে সে সমবেদনা জানালো। তারপর বললো, "এই প্রেমের তীর্থে একা আসতে কি ভালো লাগে ?"

মনে-মনে একটু হাসলুম। তার কথা শুনতে মন্দ লাগছিলো না। বরাবরই লক্ষ্য করেছি নিতান্ত সাধারণ লোকেরা তরল পানীয়ের প্রভাবে ভারি মজাদার কথা বলে। মনকে একটু হালকা করার জন্য তার কথার অল্পস্বল্প উত্তর দিতে লাগলুম। বললুম, "তা কি আর লাগে ?"

"তা হলে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন না কেন ? নাকি মমতাজের মতো তিনিও আপনাকে ছেড়ে গেছেন ?"

"ছেড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, যে-হেতু কখনই তিনি আমার জীবনে আসেননি ?"

"তা হলে আপনি অবিবাহিত ? ওল্ড ব্যাচেলার ?"

"হ্যাঁ।"

"নিশ্চয়ই আপনার কোনো প্রেমিকা আছেন। তাঁর কথাই ভাবছেন, নয় কি ?"

"ঠিক তা নয়। এ-পর্যন্ত প্রেম কিংবা প্রেমিকার দেখাই পেলাম না।"

লোকটা এতোক্ষণ বুকের উপর মাথা ঝুলিয়েই কথা বলছিলো। আমার উত্তর শুনে যেন উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলো। বললো, "বলেন কি ?"

"ঠিকই বলছি।"

"আপনার গাইড কে ?"

পাছে আমাকে চিনতে পারে এই ভয়ে বললুম, "আছে বোধ হয় এখানে কোথাও।"

"আচ্ছা গর্দভ গাইড তো। এই শীতের রাতে, এই প্রেমের তীর্থে নিঃসঙ্গ-আপনার জন্যে একজন প্রেমিকাকেও জোগাড় করতে পারলো না ! আমি যে-ট্যুরিস্টের গাইড, লক্ষ্য করে-ছিলেন তার জন্যে কেমন চমৎকার প্রেমিকা জুটিয়ে দিয়েছি ? ভদ্রলোক বললেন তিনি অবিবাহিত। অবিবাহিত না ছাই। ও-রকম ঢের-ঢের অবিবাহিত আমার জানা আছে। আসলে

বিবাহিত লোকরাই বেশি করে প্রেমিকা চায়। মুখ বদলানো —এই আর কি। আর তার জন্যে তাজমহলের এই উদ্যানের মতো ভালো জায়গা আর কোথায় আছে?—মিস্টার, আপনার দুর্ভাগ্য, আপনি একটা নিতান্ত অপদার্থ গাইডের পাল্লায় পড়েছেন। আগে যদি আপনার সন্ধান পেতুম তা হলে এ-রকম নিঃসঙ্গভাবে এখন আপনাকে বসে থাকতে হোতো না।”

বলে লোকটা আবার আগেকার মতো বুকের উপর মাথা ঝুলিয়ে ঝিমোতে লাগলো।

চাঁদের আলোয় সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। এতো কড়া জ্যোৎস্না আগে কখনো নজরে পড়েনি। দূরে পাতলা রেশমী ওড়নার মতো তাজমহল রাত্রির নিশ্বেসে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক এবং তাঁর এক-রাত্রির প্রেমিকার কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছে না।

ভেবেছিলুম লোকটা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চুরুটটা নিভে গিয়েছিলো। হঠাৎ সে সশব্দে সেই নিভে-যাওয়া চুরুটটায় প্রাণপণে কয়েক টান দিয়ে বিরক্ত হয়ে দূরে ফেলে দিলো। তারপর একটা অদ্ভুত তীব্র চাপা গলায় বলে চললো, “তাজমহল …প্রেম…এর চেয়ে বড় বোগাস পৃথিবীতে আর কিছু আছে নাকি? প্রেমের প্রতীক তাজমহল। ছাই! ক্রীতদাসদের রক্ত জল-করা পরিশ্রম দিয়ে একটির পর একটি পাথর গাঁথা হয়েছিলো। রোদে-বৃষ্টিতে ঝড়ে-জলে জন্তুর মতো মানুষগুলো

খেটেছে এক বাদশার খামকা খেয়াল চরিতার্থ করতে। মমতাজের স্মৃতি, মমতাজের অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ—এতো বড় বুজরুকি দুনিয়ায় আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। বলতে পারেন মিস্টার, মমতাজ বেগমের মৃত্যু কেন হয়েছিলো?—বেগম-সাহেবা মারা গিয়েছিলেন অত্যধিক সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে।"

লোকটার বুকের উপর আবার মাথাটা নেমে এলো।

তাজমহলের উদ্যানে বসে এক মাতাল গাইডের সঙ্গে নিশুতি রাত্রির জ্যোৎস্নায় যে একদিন প্রেম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো, কোনো দিন সে-কথা কি ভেবেছিলুম! পাইপে আবার নতুন করে তামাক ঠেসে দাঁতে কামড়ে দেশলাই জ্বালাবার আগে সত্যি-সত্যিই সেই মাতালকে প্রশ্ন করলুম, "তা হলে পৃথিবীতে কি প্রেম বলে কিছু নেই?"

লোকটা সেই মত্তাবস্থায় একটা অস্ফুট ঘড়ঘড় শব্দ করে হাসতে লাগলো। "আছে মিস্টার, আছে বৈকি! নিশ্চয়ই আছে। আমি গাইড হতে পারি, মাতাল হতে পারি, কিন্তু আমার জীবনেও প্রেম এসেছিলো। দারুণ প্রেম সাহেব। সেই প্রেমের জন্যে আমি ঘর-বাড়ি ছাড়লুম, আমার যা পাওনা সম্পত্তি ছিলো তা-ও ছাড়লুম, বন্ধু ছাড়লুম—আর আমার প্রেমিকা ছাড়লো তার স্বামীকে, তার সমাজকে। তখন আমার বয়েস কত হবে? পঁচিশ ছাব্বিশ-বছর। তখন মনে হয়েছিলো এই প্রেমের জোরে পৃথিবীকে আমরা জয় করবো। কিন্তু হায়,

মিস্টার, প্রেমের সে-জোর কই? কত জায়গায় কত ভাবে ঘুরেছি। বুঝেছি প্রেমের চেয়ে ক্ষুধার জোর বেশি। কোথাও টিকতে পারিনি, কোথাও স্থায়ী হয়ে বসতে পারিনি। অবশেষে এই প্রেমের তীর্থে এসে গাইড হয়ে বসেছি।...দি ওল্ড লাভার হ্যাজ বিকাম এ টাউট।....ট্যুরিস্ট সাহেবদের এই একই তাজমহল দেখাই ; সকালে, দুপুরে, সন্ধেয়, রাত্রে—সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে, তারার আলোয় কিংবা জ্যোৎস্নায়। আর তেমন-তেমন ট্যুরিস্ট পেলে প্রেমিকা পর্যন্ত সংগ্রহ করে দিই। সংগ্রহ করে দিতে অসুবিধে নেই ; আমার ঘরেই রয়েছ সেই প্রেমিকা। শুধু অসুবিধে হয় শীতের এই রাতগুলোয়। আমাকে একলা বসে থাকতে হয়—আর রোম্যাণ্টিক ট্যুরিস্টরা বড্ড দেরি করে ফেরে।”

আবার বুকের উপর তার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। সে বললো বটে অসুবিধে হয়, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার নাক-ডাকা'র শব্দ শুনতে পেলুম ; লোকটা নেশার ঘোরে দিব্বি ঘুমিয়ে পড়েছে, বসে-বসেই ঘুমোচ্ছে।

তার কথাগুলো ভাবতে লাগলুম। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ কেমন যেন ভয় হোলো। সেই ভয় ধীরে-ধীরে পায়ের মোটা জুতো আর গরম মোজা ভেদ করে সির-সির করে যেন উপর দিকে উঠছে! হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হতে আরম্ভ করেছে। বুকের ভিতরকার শব্দ বুঝি এবার বাইরে শোনা যাবে : সিস্‌টোল ডায়াস্‌টোল, সিস্‌টোল ডায়াস্‌টোল।

খুব সাবধানে উঠে পড়লুম। সন্দেহটা নিতান্তই যে আজগুবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু যুক্তি-তর্কের বাইরে সেই ভয়। কেবলি মনে হতে লাগলো আরো খানিক অপেক্ষা করলে আজ অনেক বছর পরে হয়তো সুনন্দা'র সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে!

যাতে কাঁকরের উপর পায়ের শব্দ না হয়, তাই শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে পা টিপে-টিপে আমি ফিরে চললুম। পিছনে পড়ে রইলো এক মাতাল গাইড, জ্যোৎস্নায়-স্নান-করা অপরূপ তাজমহল আর আমার একটা যুক্তিহীন ভয়।

চোরের মতো টাঙায় এসে চড়লুম। একবারও পিছন ফিরে চাইলুম না।

একসূত্রে

চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো : একটি সিংহ হাঁ করে থাবা উঁচিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে, তার কোলের কাছে একটি নগ্ন নারী-মূর্তি। যৌবনের লালিত্যের চেয়ে মেয়েটির মাংসল আবেদনই দর্শকের চোখে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে বিভূতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। পথের আলো বাড়িটার সামনে নেই। তাই, শহর হলেও, এখানকার জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। আর সেই শাদা আলোয় মর্মর-মূর্তি দুটি আরো বেশি করে চোখে যেন পড়ে। এটা যে শহর, ঐ মূর্তির পিছনে যে বিরাট একটি পুরোনো বাড়ি রয়েছে, সেখানে যে মানুষ বাস করে, মূর্তির সামনেই যে দেউড়ি রয়েছে, সেখানে যে দারোয়ান থাকে—এ-সব কথা বিভূতির মাথায় এলো না। নিস্তব্ধ জনহীন অরণ্যের একটা গা-শিরশিরকরা ভাবেই সে শুধু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতে লাগলো আর আশ্চর্য হোলো শুধু এই কথা ভেবে, সিংহটা অমন মাংসল শীকার পেয়েও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কেন, কেন তার ভোজ সুরু করছে না! এই ভোজের কথাটা মনে হতেই তার উপবাসী জঠরের আগুন যেন আবার নতুন করে জেগে উঠলো, আবার নতুন করে যেন দগ্ধ হতে

লাগলো তার নাড়িভুঁড়ি। খিদেয় তার বিরাট দেহটা যেন দাঁড়াতে পারলো না।

"এই! কী দেখছিস হাঁ করে?" সদর দরজার অন্ধকারে পুরোনো কাঠের চেয়ারটায় দারোয়ান বসেছিলো। বিভূতিকে লক্ষ্য করে নিতান্ত কর্তব্যবোধেই সে হাঁক ছাড়লো: "পালা।— লোকটা পাগলা নাকি?" শেষের কথাটা স্বগতোক্তি। পাগলাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বড়লোকের দারোয়ানের নেই। মিছিমিছি বসে থাকতে-থাকতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। তাই, অনেকটা মশা বা মাছি তাড়াবার মতো করেই, বিভূতিকে তাড়া দিলো।

বড়লোকের দারোয়ানের তাড়ায় সে পালালো না। বরং মর্মর-মূর্তি থেকে চোখ ফিরিয়ে সদর দরজার অন্ধকারে ঠাহর করে দারোয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বললো, "বাবু, বড় ভুখ নেগেছে। দু-মুঠো খেতে পাবো না?"

দারোয়ান হাই তুললো। তারপরেই মনে পড়লো বাড়ির বাসন-মাজা চাকরটা সকালে পালিয়েছে।—এ-লোকটা চাকরের কাজ করে না?

"দু-মুঠো খেতে পাবি না কি রে! খেতে পাবি, মাসে আট টাকা করে মাইনেও পাবি। কাজ করবি?"

বিভূতি আগে কখনো শহরে আসেনি। চাকরের কাজও করেনি। দেশে জমি-জমার কাজই বরাবর করেছে। লাঙল চষেছে,

মাটি কুপিয়েছে, ধান বুনেছে, ধান কেটেছে। কিন্তু গত বছর থেকে তার জমি-জমা আর নেই। জ্যাঠার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তারা তাড়িয়ে দিয়েছে বিভূতিকে। জমানো ধানে কিছুদিন চলেছিলো। তারপর চলছিলো লোকের মজুরি করে। তাতে কোনো রকমে আধপেটা খাওয়া চলছিলো বটে কিন্তু পরনের কাপড়ের সংস্থান কিছুতেই করতে পারেনি। লোকমুখে সে শুনে-ছিলো, রেলগাড়ি চেপে শহরে আসা যায় আর সেই শহরে চাকরি করলে পেট ভরে ভাত এবং গা ভরে জামা-কাপড় পাওয়া যায়। তাই কোনো রকমে রেলগাড়ি চেপে গত তিন দিন হোলো সে শহরে পৌঁচেছে। সঙ্গের আনা-চারেক পয়সা গতকাল সকালেই খাবার কিনে গেছে খরচ হয়ে। তারপর থেকে সে ক্রমাগতই ঘুরেছে। না জুটেছে খাবার, না জুটেছে চাকরি। এমন কি এক মিনিটের জন্য একটা মানুষকে থামিয়ে একটি কথাও সে বলতে পারেনি। শহরের মানুষগুলো এতো ব্যস্ত আর রুক্ষ আগে জানলে এই শহরে আসার কথা আরো ভালো করে সে নিশ্চয়ই ভেবে দেখতো।

কিন্তু বর্তমানে তার অন্য কোনো ভাবনা নেই: একমাত্র আহারের চিন্তাই ঘুরছে মাথায়। খিদেয় এক-একবার মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঘুরে উঠছে। খাবার না পাক, অন্য কেউ পেট ভরে খাচ্ছে এই দৃশ্যতেও সে খানিকটা তৃপ্তি বোধ হয় পাবে। তাই চাঁদের আলোয় হঠাৎ ঐ সিংহ আর নগ্ন নারী-

মূর্তির মাংসল রূপ দেখে নিজের অজানাই একটা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

দারোয়ানের কথা শুনে প্রথমে সে বিশ্বাস করতেই পারলো না। তাই নিজে আবার পাল্টা প্রশ্ন করলো, "দুবেলা খেতে পাবো? পেট ভরে ভাত খেতে পাবো?" মাসে আট টাকা মাইনের কথাটার চেয়ে দুবেলা পেটভরে ভাত খাবার সম্ভাবনায় তার সমস্ত শরীরে বারবার রোমাঞ্চ হতে লাগলো। কতদিন দুবেলা পেটভরে খেতে পায়নি! কতদিন যে পায়নি আজ সে-কথা স্পষ্ট মনেও পড়ে না। তার বিরাট দেহটা ক্ষুধার আগুনে পুড়ে-পুড়ে দড়ির মতো পাকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।

সে ভেবেছিল অনায়াসে একটা পুরো হাঁড়ির ভাত শেষ করে ফেলবে। কিন্তু রাত্রে কানা-উঁচু থালার শাদা ভাত, হলদে ডাল, সবুজ লঙ্কা আর তরকারির সামনে বসে কেমন যেন ঘুম পেতে লাগলো তার। দু-মুঠো ভাত পেটে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হোলো আর সে পারবে না। তার মাথাটা অল্প-অল্প ঘুরছে। ইচ্ছে হোলো মুখ হাত না ধুয়েই সেই খাবার জায়গায় কাঁধের উপরকার দুর্গন্ধময় ছেঁড়া-গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। তবু কষ্ট করে আরো দু-মুঠো ভাত সে খেলো, ঢকঢক করে ছোটো ঘটির জলটাও শেষ করলো, তারপর রইলো হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে। সে ঘুমিয়েও নেই জেগেও নেই।

বিদ্যুতের আলোগুলো যেন অনেক দূরে সরে গেছে, পাশের মানুষটা যেন নদীর অন্য পার থেকে কথা কইছে, সেই বাড়িটা যেন অরণ্য হয়ে গেছে আর অনেক ঝিঁঝিঁ একটানা সেখানে যেন ডেকে চলেছে।

এমন অদ্ভুত কাণ্ড যে ঘটবে কে জানতো : ভাত খেয়ে তার নেশা হয়ে গেছে! কানের পাশে আর কপালের নীচে দুটো শিরা দপদপ করছে। হাত ধুতে উঠে দেখলো পায়ের পাতা-গুলো ঠিকমতো পড়ছে না। একবার ভয় হোলো এখনি বুঝি তাকে আবার রাস্তায় বার করে দেবে। তারপরেই হাসি পেলো বিভূতির। অত বড় রাস্তায় ঘুমোবার জায়গার তো অভাব নেই! কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে দিব্বি আরাম করে ঘুমোতে সে পারবে। কেবল ঘুমোবে : পাঁচদিন, সাতদিন, দশ দিন। আর কখনো জেগে উঠবে না।

কিন্তু কী আজগুবি কাণ্ড! দক্ষিণ-খোলা বারান্দার এক কোণে কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে সত্যি-সত্যি সে যখন শুয়ে পড়লো ঘুম তখন কোথায়? হাতে পায়ে জোর নেই সত্যি, ঘাড়টা কাত করে থাকায় টনটন করা সত্ত্বেও পাশ ফেরবার ইচ্ছে করছে না এ-কথাটাও মিথ্যে নয়—কিন্তু ঘুম কোথায়?···বিভূতির বৌ-এর তখন কথা আটকে গেছে, ওলাওঠা হয়েছিলো। নড়তে-চড়তে পারছিলো না—কিন্তু ঠিক এই রকম জ্বলজ্বল করে চেয়েছিলো মরবার আগে পর্যন্ত। কতদিন আগে বৌটা যে মরে গেছে তার

হিসেব করতে গিয়ে বিভূতির সব গোলমাল হয়ে গেলো। তারপর ইচ্ছে হোলো অনেক বছর পরে আজ রাত্রে দক্ষিণের এই খোলা বারান্দার ফুরফুরে বাতাসে ক্লান্ত হাত-পা ছড়িয়ে টনটনে ঘাড়টা নিয়ে একটু সে কাঁদে! তিনদিন পরে দুমুঠো ভাত খেয়ে মরা-বউটার জন্য বিভূতির সত্যি-সত্যি খুব কাঁদতে ইচ্ছে করলো। তারপর শরীর-জুড়নো দক্ষিণে বাতাসে আবার তার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেলো। বাড়ির অনেক আলো নিভে গেছে। দেউড়ির ভিতর বিজলি বাতিটাও নিভোনো। দারোয়ান তার খাটিয়া বাইরে টেনে শুয়ে পড়েছে। আকাশের চাঁদটা গেছে সরে। সেই সিংহ আর নারীমূর্তির উপর এখন আলো নেই। শাদা জ্যোৎস্নায় সিংহের থাবাটা শুধু চকচক করছে আর নারীমূর্তির কাঁধের ওপাশের স্তন দুটি আশ্চর্য রকম নিটোল দেখাচ্ছে।

বিভূতির সমস্ত শরীরটা এবারে বুঝি খুলে-খুলে আলাদা হয়ে যাবে। নিজের দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে নিজেকে যেন সে দেখতে লাগলো। নিজেকে সে দেখলো, মরা-বৌটার কথা ভেবে একবার কাঁদতেও চেষ্টা করলো। তারপর সিংহের কোলের কাছে জ্যোৎস্নার আলো-ছায়ায় নারীমূর্তির নগ্নতায় ভীষণ লজ্জা পেলো বিভূতি। সত্যি-সত্যিই সে চোখ বুজলো।

আর চোখ বোজবার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন অদ্ভুত ভোজবাজী সুরু হয়ে গেলো। তার সমস্ত শরীরটা ছুটেছে বাতাসের

আগে। দামোদরে গভীর কালো ঢল নেমেছে। সেই কালো বন্যার বুক-কাঁপানো সোঁ-সোঁ শব্দ কানে বুঝি তালা ধরিয়ে দেবে। গাছের ডাল ধরে কতক্ষণ সে ঝুলে থাকবে? গাই-বলদগুলো ভেসে যাচ্ছে খড়কুটোর মতো। বাগদিদের সেই ঝুমকো-চুলো কচি মেয়েটা ঘূর্ণির মধ্যে দু-চার পাক ঘুরে টুপ করে কোথায় মিলিয়ে গেলো। কোন দেবতার নাম স্মরণ করবে বিভূতি ঠিক করতে পারছে না। ডালের উপর কোনো রকমে উঠে বসতে পারলে হয়। কবেকার সেই ভুলে-যাওয়া ঝড়-বৃষ্টি আর কালো বন্যা আজ আবার ফিরে এলো! প্রাণপণে চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে বিভূতি শুয়ে রইলো, কিন্তু আশ্চর্য, ঘুম তার এলো না।

চোখ বুজেই সে জেগে রইলো, কোথা দিয়ে যে সময় কাটতে লাগলো নিজেই জানে না। সময় যে এত তাড়াতাড়ি কাটে তার জানা ছিলো না।

ধীরে-ধীরে সেই কালো বন্যার জল মিলিয়ে গেলো। সেই গাছের ডাল থেকে কী করে সে যে দক্ষিণের বারান্দায় আবার ফিরে এলো কে বলবে? বান-ডাকার বুক-কাঁপানো হুহু শব্দ আর নেই। তবে আশেপাশের নারকেল গাছগুলোর মর্মর এখন বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ঘাড়ের কাছটা টনটন করছে সত্যি, তবে হাত-পাগুলো অতটা অবশ আর নেই। পেটের মাঝখানটা শুধু মুচড়ে উঠছে মাঝেমাঝে। আবার চোখ মেলে

বিভূতি পড়ে রইলো। সমস্ত আকাশটা বিধবার থানের মতো ধবধবে শাদা। মাঝেমাঝে কালো-কালো বাদুড় উড়ে চলেছে। দুয়েকটা প্যাঁচাও আছে নিশ্চয়। মাথা না ঘুরিয়ে বারান্দার ভিতর দিকে সে চাইলো। চাঁদের আলোয় রেলিঙের লম্বা-লম্বা ছায়া পড়েছে, ছাত থেকে যে-কাপড় শুকোচ্ছে তার ছায়াও এই বারান্দার চাঁদের আলোয় মাঝেমাঝে কাঁপছে। একটা শাদা আর কালো রঙের বেড়াল দাঁতে কী একটা চেপে নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে বারান্দার শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ালো। একবার ঘাড় ফিরিয়ে যেন বিভূতিকেই দেখে নিলো। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। তারপর আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ছাতের ঐ কাপড়টাকে খুলে নিয়ে কী করে বাড়ি থেকে বেরুনো যায় এই কথা বিভূতি যখন ভাবছে আর পেটের মাঝখানকার মোচড়ানোর যন্ত্রণায় মাঝেমাঝে সে যখন মুখ বিকৃত করছে এমন সময় খুট করে একটি শব্দ হওয়ায় সে চমকে উঠলো। হাত পনের দূরের দরজাটায় জ্যোৎস্না এখনো পৌঁছোয়নি। সেই দরজাটা খুলে গেছে। শাদা থান পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। বিভূতির শরীর পাথরের মতো, চোখ দুটো আধবোজা। মেয়েটি ধীরে-ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর বিভূতিকে স্থির হয়ে মরার মতো পড়ে থাকতে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে সরে গেলো। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াতে তার মুখে চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এতোক্ষণে বিভূতি চিনলো তাকে। ইনিই

চাকরবাকরদের তদারক করছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিলো বুঝি বাড়ির ঝি। তারপর সে শুনলো ইনি পিসিমা। বাড়ির কর্তাবাবুর মাঝ-বয়সী বিধবা বোন। কিন্তু কর্তাবাবুর সাক্ষাৎ বিভূতি পায়নি।

মেয়েটির শাদা ঘোমটা খসে গেছে। বাতাসে তার ঘাড়ের ছোটো-ছোটো চুলগুলো উড়ছে। চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে-দেখতে বিভূতির কেমন যেন মনে হোলো এ-মেয়েটিও পাথর দিয়ে গড়া। বারান্দার পাশে একে কে যেন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কেউ আবার না তুলে নিয়ে গেলে যাবে না।

কিন্তু বিভূতির অনুমান যে ভুল খানিক পরে দেউড়িতে মোটরের শব্দ হতেই সে-কথা বোঝা গেলো। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় আবার সেই অন্ধকার-দরজার মধ্যে সে মিশে গেলো। তারপর খুট করে খিল তোলার শব্দ গেলো শোনা। অন্ধকার তাকে গিলে যেন হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

মোটরের হেড-লাইট দুটো দপ-দপ করেছে। ততক্ষণে দেউড়িতে দারোয়ান বিছানা ছেড়ে ফটক খুলেছে। বেশ কষ্ট করেই একটু পাশ ফিরে বিভূতি দেখতে লাগলো। দারোয়ান ফিরে এসে তার খাটিয়াটা হড়হড় করে একপাশে টেনে মোটর যাবার পথ করে দিলো। বাড়ির ভিতরে কাঁকরের উপর গাড়ির চাকার একটা অদ্ভুত মর্মর শব্দ উঠলো। তারপর থামলো ইঞ্জিন।

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হোলো। হাফ শার্ট আর ধুতি-

পরা ড্রাইভার নেমে দারোয়ানকে বললো, "এঃ, গাড়ির ভেতরটা আজ আবার বমি করে ভাসিয়েছে। তুই দৌড়ে গিয়ে চাকর ছুটোকে ডাক। কত্তা তো বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে। তার লাসটা টেনে ঘরে তুলতে হবে।"

চাকর ডাকতে দারোয়ান অদৃশ্য হতেই ড্রাইভার গাড়ির পিছনের দরজা খুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হোলো। তারপর বেরিয়েই কী যেন একটা জিনিস বার করে ক্ষিপ্র হাতে চাঁদের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলো, বিভূতি ঠিক বুঝলো না। ড্রাইভারও ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলো না। অন্ধকারে কাদের পায়ের শব্দ বিভূতি শুনতে পাচ্ছে। দারোয়ান নিশ্চয়ই চাকর নিয়ে ফিরছে। কুট করে শব্দ হোলো ড্রাইভারের হাতে। তারপর বিভূতি দেখলো দ্রুত-পায়ে ড্রাইভার সেই মর্মর-মূর্তির কাছে এগিয়ে হাতের সেই জিনিসটা সিংহের থাবার উপর রেখে ফিরে এলো।

কর্তাবাবুর গোঙানি এতক্ষণে শোনা যাচ্ছে। ড্রাইভার, দারোয়ান আর ছুটো চাকর বহু কষ্টে সেই ভারি দেহটা নামিয়ে চ্যাঙ-দোলা করে নিয়ে গেলো বাইরের একটা ঘরে। খানিক জল ঢালার শব্দ শোনা গেলো। খানিক কর্তাবাবুর বমির শব্দও গেলো পাওয়া, তারপর গোঙানি সুরু হোলো, তারপরে সেই গোঙানির শব্দ কমে এলো। চাকর ছুটোকে আর দেখা গেলো না। সম্ভবত তাদের কাজ সেরে শুয়ে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে

এলো দারোয়ান আর ড্রাইভার।

দারোয়ান প্রশ্ন করলো, "কটা বাজে ডেরাইবারবাবু ?" হাতের ঘড়িটা চোখের কাছে তুলে ড্রাইভার জবাব দিলো, "আড়াইটে।—যা তুই শুয়ে পড়।"

"গাড়িটা আগে গ্যারাজে তুলে দিন। বমির গন্ধে যে ভূত পালাবে, ডেরাইবারবাবু!"

"যা বলেছিস", বলে ড্রাইভার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে কাঁকরের উপর মর্মর শব্দ তুলে সোজা চলে গেলো। দারোয়ানও তার খাটিয়াটা আবার হড়হড় করে রাস্তার মাঝখানের জ্যোৎস্না আর দক্ষিণে বাতাসের ভিতর টেনে এনে বসলো। বসে দোতালার যে-বারান্দায় বিভূতি শুয়ে সেই বারান্দার দিকে চেয়ে বিড়ি ধরালো।

অল্প পরেই আবার মচমচ শব্দ করে ড্রাইভার ফিরলো। দারোয়ানকে বললো, "এখনো ঘুমোসনি ?" কয়েকবার সেই মর্মর-মূর্তির কাছে ঘুরঘুর করে নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করে সে আবার ফিরে গেলো।

কর্তার গোঙানি ক্রমশ কমতে-কমতে প্রায় মিলিয়ে এসেছে। বাইরের নারকেল গাছের মর্মরের ভিতর সেই গোঙানি আর প্রায় শোনাই যায় না। খাটিয়ায় বসে দারোয়ানের বিড়িটাও পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। বিড়িটার সেই লালচে আগুন জ্যোৎস্নায় মাঝে-মাঝে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হচ্ছে। বিভূতির পেটের ভিতরটা

থেকে-থেকে বেশ জোরেই খোঁচাচ্ছে। একটু গোঙাতে পারলে বোধ হয় সে আরাম পেতো। হয়তো গোঙাতও। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবার দোতলার সেই ঘরের দরজাটা খুট করে খুলে গেলো আর কালো অন্ধকারের ভিতর থেকে শাদা কাপড়ের অস্পষ্ট একটি অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে কর্তা-বাবুর সেই বিধবা বোনে রূপান্তরিত হোলো।

হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে দারোয়ান উপরে চাইলো। মাঝ-বয়সী মেয়েটির মাথায় ঘোমটা খুলে ঘাড়ের কাছের সেই ছাঁটা চুলগুলো বেরিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সে হাতছানি দিলো আর অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে, যাতে কাঁকরে মচমচ শব্দ না হয়, উপরে উঠে এলো দারোয়ান। তারপর নিতান্ত জানা ব্যাপারের মতো কোনো দিকে না চেয়ে ঢুকলো মেয়েটির ঘরে। সেই স্পষ্ট নারী-মূর্তি জ্যোৎস্না থেকে ছায়ায় এসে ক্রমশ ধোঁয়াটে শাদা অন্ধকার হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেলো। শব্দ হলো খুট।

পেটের ভিতরটা দারুণ মোচড়াচ্ছে। বিভূতি উঠে দাঁড়ালো। হাতে-পায়ে খিল ধরেছে যেন। তবু চটপট ছাদে উঠে কাপড়টা পোঁটলা বানিয়ে নীচের সেই মর্মর-মূর্তির কাছে পৌঁছতে দেরি করলো না, তারপর সিংহটার থাবার উপর থেকে ড্রাইভার যে জিনিসটা রেখেছিলো সেটা তুলে নিলো। একটা ভারি মানিব্যাগ, ভিতরে কত টাকা আছে কে জানে। গেট পেরুবার সময় আর

একবার জোরে পেটটা মুচড়ে উঠলো আর ফটকের ওপাশে নেমে কয়েক গজ যেতে-না-যেতেই রাত্রির পাহারাওয়ালার হাতে তার কাঁধের সেই দুর্গন্ধময় গামছাটা পড়লো ধরা।

"শালা চোট্টা, কাঁহা ভাগতা রে?"

পাহারাওয়ালার চড়ে যতটা লাগবে ভেবেছিলো, আশ্চর্য, বিভূতির ততটা কিন্তু লাগলো না। শুধু হাত ফস্কে মানিব্যাগটা রাস্তায় পড়ে গেলো।

চক্ষের নিমেষে পাহারাওয়ালা তাকে ছেড়ে মানিব্যাগটা কুড়িয়ে নিলো। ডান হাতের উপর একবার সেটা নাচিয়ে বেশ খুসি-খুসি সুরেই সে বললো, "শালা চোট্টা, জলদি ভাগ। নেহি তো ফাটকমে পুরবো।"

এই হিন্দি-বাংলা মেশানো কথার মানে বুঝতে বিভূতির কিন্তু কোনো অসুবিধে হোলো না। কোনো কথা না বলে সে চলতে সুরু করলো। পেটের ভিতরটা যে-রকম মোচড়াচ্ছে তাতে সামনের গাড়িবারান্দা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়। সেখানে শাদা কবরের মতো সারিসারি অনেক মানুষ ঘুমোচ্ছে। তারও একটু জায়গা সেখানে হবে বৈকি।

জমিদারের বাড়িটা পেরুবার সময় একবার পিছন ফিরে দেখবার লোভ সে সামলাতে পারলো না। একবার দোতলার সেই অন্ধকার বারান্দার দিকে আর একবার সেই মর্মর-মূর্তির দিকে সে চাইলো—চাঁদের আলোয় এখন আবার স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে : একটি সিংহ হাঁ করে থাবা উঁচিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে, তার কোলের কাছে একটি নগ্ন মাংসল নারী-মূর্তি।

আফিস

'শেষের কবিতা'র বিমি বোস আবিষ্কার করেছিলো দার্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই। ১৯৪২ সালে নতুন দিল্লির আপিসে চাকরি নিয়ে ঢুকে আমিও স্পষ্ট দেখলুম সেখানে শুধুই কেরানী আছে, কিন্তু মানুষ কই? সব মানুষগুলোই কেরানী, শুধু কেরানী। কেউ বড়লোক কেরানী, কেউ বা গরীব লোক কেরানী। কারুর বা মোটর আছে, কারুর বা সাইকেল, আবার কারুর বা কিছুই নেই। শুধু সবাইকারই যা আছে তা হচ্ছে খাঁটি কেরানীত্ব। একই ধরনের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, একই ধরনের বাঁকা মেরুদণ্ড, নিষ্প্রভ চোখ, অসুস্থ কল্পনা। একই ভাবনা: কী করে উপরওলাকে খুসি করবো, কী করে উঁচু চেয়ারে বসবো! —চমৎকার, নিখুঁত, কার্যকরী একটি যন্ত্র বানিয়েছে এই বণিক সভ্যতা। নির্ভুল হিসেবে সেই যন্ত্র কাজ করে যায়। এখানে কেউ নয় কারুর সমান, সবাইকারই আছে একজন উপরওলা। যে-লোকটা ছেঁড়া খাকি উর্দি পরে আপিসের দরজা প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধ করে কিংবা যিনি মস্ত মসৃণ ক্যাডিল্যাকে সবচেয়ে দামী গরম কাপড়ের স্যুট পরে আপিসে আসেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই আছেন এক-একজন উপরওলা: যাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু ভুল করলে যাঁর চোখরাঙানী

স্পষ্ট অনুভব করা যায়; যাঁকে বোঝা যায় না—অথচ যাঁর কড়া সিগারের গন্ধে সেক্রেটারিয়েটের লাল বাড়ির ঘুলঘুলিগুলো পর্যন্ত আমোদিত; যাঁর স্বর শোনা যায় না, অথচ রাজার জন্ম-দিনে কিংবা বছরের নতুন দিনে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যিনি খাঁ সাহেব থেকে নাইটহুডের পুষ্পবৃষ্টি করেন—আর যে-সব ভাগ্যবান ব্যক্তিরা পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ইহজীবনে সেই সব সম্মান লাভ করে তারা, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে-করতে বন্ধুবান্ধবদের তেলে-ভাজা সামোসা (অর্থাৎ সিঙাড়া) থেকে নিজেদের পদমর্যাদা-মতো ককটেল ও ডিনার পার্টি দেন। চমৎকার যন্ত্র এই ইম্পিরিয়ালিজমের।

নতুন দিল্লির এই নতুন বাড়িতে পা দিয়েই মনে হোলো আমার মধ্যে অদ্ভুত একটি পরিবর্তন আসছে : যখন কাজ করছি কিংবা করছি না, ঘুমুচ্ছি কিংবা ঘুমুচ্ছি না—প্রত্যেক মুহূর্তেই আসছে একটি পরিবর্তন। জীবন-যৌবন-ধন-মান—সব কিছু সম্বন্ধে আমার এতোদিনকার ধারণার আমূল পরিবর্তন আসছে। আর কোনো ভাবনা নেই। জীবনকে অতিক্রম কর-বার লাল সিঁড়ি পেয়ে গেছি। ধাপে-ধাপে উঠে যেতে পারলেই হোলো। একটি তৈলাক্ত মসৃণতায় সমস্ত মন ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। আর কিছুদিন কাজ করলেই মানুষ খোঁজবার বাতিক আমার চলে যাবে। মানুষ থেকে আমিও একজন ছাঁচে-ঢালা নিখুঁত ও নির্বিবাদী কেরানী হয়ে আসবো কোনো এক শুভ

মুহূর্তে। নিঃসন্দেহেই শুভ সেই মুহূর্তটি। কারণ জীবন তখন কত সহজ! জীবন-দর্শন তখন একেবারেই মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু সে-সব তো ভবিষ্যতের কথা। আপাতত, যতদিন আমি সম্পূর্ণ বদলে যাবো না, ততদিন এই আবহাওয়ায় কী করে থাকবো ভেবে পাচ্ছিলুম না। তাই মূর্খের মতো মানুষ খোঁজবার চেষ্টা করে বারবার হতাশ হয়ে পড়ছিলুম। আর প্রতি হতাশার সঙ্গে একটি ক্লান্তিকর মন্থরতায় যেন আসছিলুম অবশ হয়ে।

একটি ছোটো বাক্সের মতো ঘরে আমরা চারজন কেরানী বসতুম। চারজন এসেছি ভারতবর্ষের চারদিক থেকে: কলকাতা, ত্রিচিনপল্লি, বোম্বাই আর করাচি। আমরা একই জায়গায় বসে একই ধরনের কাজ করে চলেছি প্রত্যহ। অথচ কেউ কাউকে ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা চলেছে: কে পারবে কয়েক হাত দূরের উপরওলার ঠোঁটে সর্বাগ্রে হাসি ফোটাতে—যিনি কার্পেটের উপর পা রেখে অন্য আর এক অফিসারের তরুণী স্ত্রী এবং নিজের উপরওলার মন কী করে পাওয়া যায় সে-কথা ভাবেন একটি বিদেশী ফিল্ম-জার্নালের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে।

আমাদের এই ছোটো ঘরের দরজার পাশে সর্বদা বসে থাকে প্রৌঢ় এক চাপরাশি। মাথায় পাগড়ি, ময়লা পাজামা, ছেঁড়া নাগরা, গায়ে উর্দি। চুলগুলো সব পেকে গেছে। রোদে পুড়ে সমস্ত মুখ কয়লার মতো কালো, তার উপর অসংখ্য বসন্তের

দাগ। লোকটা সর্বদাই যেন ঝিমোচ্ছে। টুলে মাথা নীচু করে বসে থাকে নিশ্চল হয়ে। ঠিক তখন মনে হয় অনেক শতাব্দী আগেকার মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া একটি টেরাকোটার মূর্তি যেন। লোকে বলে সে নাকি আফিং ধরেছে। কোটরের মধ্যে অদৃশ্য-প্রায় তার দুটি চোখ। সেই চোখে আনন্দ বা বেদনার কোনো রোমাঞ্চ কোনোদিন ধরা পড়ে না। প্রায়ই নির্বাক হয়ে বসে থাকে। তাকে ডাকবার পর নিঃশব্দে একটি ছায়ার মতো এসে দাঁড়ায়। আদেশ করলে কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে যায় বেরিয়ে। আদেশটা সে শুনতে পেলো কিংবা বুঝতে পারলো কি না কিছুই জানা যায় না। কিন্তু কোনো কাজে ভুল তার নেই। হুকুম তামিল করে আবার সে ফিরে যায় নিজের টুলে। পরমুহূর্তেই বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তার পাগড়িশুদ্ধু মাথা। সুরু হয় তার ঝিমুনি : এই বিরাট লালবাড়ির আধো-আলো আধো-অন্ধকার সরু গলির কোণে ছোটো বাক্সর মতো একটি ঘরের পালিশকরা কাঠের দরজার পাশে টুলে বসে আফিঙের রঙীন স্বপ্ন দেখে। এই বণিক-সভ্যতার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মিলিয়ে আসে তার কাছে। লোকটাকে দেখে কেমন যেন হিংসে হয়। এই আবহাওয়া থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখবার চমৎকার মন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে।

কি জানি কী কারণে লোকটা আমার উপর প্রসন্ন ছিলো। প্রত্যহ সকালে যখন সাইকেল থেকে নামতুম, দেখি সে দরজার

গোড়ায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে সে আমাকে সেলাম করতো ; তারপর আমার কাছ থেকে সাইকেলটা নিয়ে পিছন-পিছন উঠে আসতো দোতলায়। আমাদের ঘরের পাশে সাইকেলটা নামিয়ে নিজের বাঁ কাঁধের উপরকার ঝাড়ন দিয়ে খুব যত্ন করে সমস্ত ধুলো মুছে, তালা লাগিয়ে সাইকেলের তালার চাবিটা আমার টেবিলের উপর রেখে যেতো। ততক্ষণে আমি চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি। আমার চেয়ার, আমার টেবিল ঝকঝক করতো। টেবিলের উপরকার কাগজগুলো সযত্নে এক পাশে কাঁচের পেপার-ওয়েট চাপা দেয়া থাকতো, পরিষ্কার কাঁচের গেলাসে ভরা থাকতো জল ; আর দেখতুম নতুন এক প্যাকেট সিগারেট সামনেই রয়েছে আমারি অপেক্ষায়। ইসমাইল—তার নাম ছিলো ইসমাইল—প্রত্যহ আমার জন্য ঐ সিগারেট আসতো নিয়ে। মাসের শেষে দাম চুকিয়ে দিতুম। কিছু-কিছু বকসিসও দিতুম। সেই রকম সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেলাম করে সে শুধু বলতো : "হুজৌর ! আপ কি মেহের-বানি।" তারপর ফিরে যেতো নিজের টুলে। আর ঘরের তুলনায় বিরাট জানালাটার ভিতর দিয়ে আমি বাইরে চেয়ে থাকতুম : বৃষ্টি-ধোয়া বাইরের আকাশ নীলার পেয়ালার মতো ঝকঝক করছে। তুষারের পাহাড়ের মতো শাদা একটি মেঘ দক্ষিণ-পূব কোণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। চোখ-ধাঁধানো তার ঔজ্জ্বল্য।

জানালার নীচেই একটি চৌকো পাথর-বাঁধানো উঠোন। দুপুরের দিকে সেখানে বড়লাট সায়েবের দরবারের এক-একজন সভ্য নানা বিচিত্র বেশে এসে নামেন। সোনালি জরির কাজ-করা গরম লাল কাপড়ের উর্দি-পরা, কোমরে হাতির দাঁতের বাঁটওলা ছোরা-গোঁজা চাপরাসিরা সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ায়। সেই উঠোন পেরিয়ে আরো নীচে চেয়ে দেখি, কালো পিচের পথ, অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন। মাঝে-মাঝে লাল পাথরের ফোয়ারা। মাঝখানে পুলিশ। লাল তার পাগড়ি। সাইকেলে অসংখ্য লোক পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে আসছে। দুটো ছাত-খোলা টাঙা, চারজন সোয়ারি। টুং-টুং শব্দ খুব মৃদু হয়ে, হালকা হয়ে এই দোতলার জানালায় ভেসে আসছে। এক সারি ফিরিঙ্গি মেয়ে—টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফার—হলদে আর শাদা আর সবুজ ছোটো স্কার্ট পরা, সাইকেলের সামনে বেতের বাস্কেট; কোনোটাতে কুকুর, কোনোটাতে টিফিন-কেরিয়ার আর বই—বাঁ-দিকে হাত দেখিয়ে তারা বেঁকে গেলো। কালো রাস্তাটা সোজা পূবদিকে চলে গেছে। দু'পাশের রুক্ষমাঠ বর্ষার পর বড়-বড় সবুজ ঢেউ-খেলানো ঘাসে গেছে ছেয়ে। চিনে কমলালেবুর গাছের তলায় একটা ঘোড়া বাঁধা। লাল ঘাঘরা-পরা মজুর মেয়েরা ঘাস কাটতে ব্যস্ত। সবুজের বন্যায় মাঝেমাঝে তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের ছাড়িয়ে সোজা চলেছে এই কালো পথ। ওয়ার-মেমোরিয়্যাল-আর্চটা খুব ছোট্ট দেখায়। গত মহাযুদ্ধে যারা

মরেছিলো, তাদের সম্মান দেখাবার জন্য এই আর্চের উপর অসংখ্য নাম খোদাই করা আছে। আগে সর্বদা ধূনি জ্বলতো। অনেকদিন সেই ধূনির ধোঁয়া দেখিনি। বর্তমান মহত্তর যুদ্ধে (যুদ্ধ যদি মহৎ হয়, তা হলে এই যুদ্ধকে মহত্তর বলতে হয় বৈকি !) যারা মারা পড়লো তাদের স্মৃতিস্তম্ভ নতুন দিল্লির কোনখানে খাড়া করা হবে ? কতদিন জ্বলবে তাদের উদ্দেশ্যে ধূনির আগুন ? কাটা-কাটা এই ধরনের ছোটো-ছোটো সমস্যা মগজ দিয়ে চলে গেলো। কিন্তু কালো রাস্তাটা থামেনি। সোজা চলেছে। কিঙসওয়ে। সেখানকার মস্ত ফোয়ারার কাছে রয়েছে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মর্মর-মূর্তি। মস্ত মূর্তি। কিন্তু দৈর্ঘ্যের তুলনায় রাজার মাথাটি হাস্যকর রকম ছোটো। সেকাল হলে হয়তো রাজার ছেলে পিতার এই অপমানে শিল্পীর মাথাটাই দিতেন উড়িয়ে।...কালো রাস্তা আরো অনেকটা এগিয়েছে তারপর আর তাকে দেখা যায় না।

এখান থেকে মনে হয়, দিগন্তের কাছেই যেন রয়েছে পুরোনো ভাঙা কেল্লা। অতীতের সাক্ষী। জ্যামিতির ক্লান্তিকর ছাঁচে-ঢালা এই ঝকঝকে চকচকে নতুন দিল্লির ওপাশেই পুরোনো কেল্লাকে দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। এ-কেল্লা নাকি মহাভারতের যুগের। পঞ্চপাণ্ডবদের সৃষ্টি। এখনো তার নাম পঞ্চপাণ্ডবের কেল্লা। পরে সেখানে আসেন হুমায়ুন, আসেন শের সাহ। এই কেল্লার লাইব্রেরির সিঁড়িতে পা পিছলে পড়েই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছিলো। ভাবতে কি রকম যেন খাপছাড়া লাগে। রাজা-রাজড়ার

মৃত্যু হবে হাতির পিঠে, যুদ্ধের গেরুয়া বাতাসের মধ্যে, সূর্যের আলোয় সোনার মতো ঝকঝকে বর্শা-ফলার চুম্বনে।—তা নয়, পা পিছলে মৃত্যু ? এ যে নিতান্তই সাধারণ ! এ মৃত্যু কেরানীদের হওয়া উচিত।

…খণ্ড-খণ্ড শাদা মেঘ অকস্মাৎ কোথা থেকে ভেসে এলো। পুরোনো কেল্লার ধ্বংসস্তূপের উপর কখনো রোদ চমকাচ্ছে, কখনো শ্যামল ছায়া নামছে। অতীতের ঔজ্জ্বল্য : তার পাহাড়ের মতো হাতির সারি, বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র ঘোড়সওয়ার, তার মণি-মুক্তো হীরে-পান্না, রেশমের আংরাখা, জরির আবা, জহরতের শেরপ্যাঁচ, পাখীর শাদা পালক ; তার সহস্র-সহস্র সুন্দরীর ঢোলা-পাজামা, আঁটা কাঁচুলি, মসলিনের ওড়না, ধূসর-নীল চোখের বিদ্যুৎ, ডালিমের মতো ঠোঁটের হাসি, হাতির দাঁতের মতো শাদা মসৃণ হাত ; তার স্ফটিকের পেয়ালা, কস্তুরি তামাকের আলবোলা, গোলাপজলের ফোয়ারা ; তার রাত্রির অন্ধকারে রাত্রির চেয়েও কালো, পাথরের চেয়েও সুগঠিত হাবসি খোজা প্রহরী ; ঝকঝকে তাদের দাঁত, চকচকে তাদের ছোরা ; তাদের কারুর বুকে বেগমের প্রতি প্রেম, যাদের দেহ জ্যোৎস্নার চেয়েও হালকা, ফুলের চেয়েও নরম—সেই সব ইতিহাস এই কেল্লার পাথরের প্রতিটি ফাটলে যেন আজকেও সযত্নে তোলা আছে। ভাবতে-ভাবতে যেন মাথা ধরে, দৃষ্টি অলস ও শিথিল হয়ে আসে। ঘুম পায়। শুধু দূরের পুরোনো কেল্লার ভাঙা

গম্বুজের উপর সূর্যের চমক আর মেঘের ছায়া দেখি। তার পাশের সবুজ মাঠে ছুটি শাদা পায়রার মতো তাঁবু।···আকাশের প্রশান্তিকে ছিঁড়ে একেবারে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো কতকগুলো এয়ারোপ্লেন ? পিচের পথ দিয়ে ক্যামোফ্লাজ-রঙের ছুটো মিলিটারি লরি চলেছে। এই উঁচু বাড়ির ভিতর দিয়ে-দেখা ট্রাফিক পুলিশ আর মানুষের মিছিল দেখতে-দেখতে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড পুতুল খেলার রাজ্যে বসে আছি।

বাংলাদেশে এ-সময় শরতের আমেজ এখনো কাটেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে এদিকে বেশ শীত পড়ে গেছে। প্রত্যহ বাড়ছে সেই ঠাণ্ডা। সকালে আপিসে আসার সময় মনে হয় হাতে দস্তানা পরতে পারলে আরাম হোতো। দেখতে-দেখতে গাছের পাতার রঙ যাচ্ছে বদলে। মাঠগুলো খালি-খালি হয়ে আসছে। এ-দেশের ঘাসের আয়ু ভারী কম। যমুনা বর্ষার বন্যায় কিছুদিন কূলেকূলে ভরেছিলো। এখন আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। এ-বছরের মতো তার যৌবনের চাপল্য শেষ হোলো। অথচ বাংলাদেশে এখনো নিটোল নদীর স্রোত, খানা-ডোবা-পুকুর ; নদীর তীরে কাশফুল এখনো বিবর্ণ হয়ে আসেনি। বেশ বুঝতে পারি, কলকাতার পথ দিয়ে সকালে যেতে-যেতে কোনো বাড়ির রেডিওয় হঠাৎ সানাই-এর সুর শুনলে প্রথম শরতের নেশাই মনকে আচ্ছন্ন করে। এইতো সেখানে সবে পূজো শেষ হোলো !

কালী পূজোর দিন এখানকার আপিসের প্রায় সব হিন্দুরাই ছুটি পেলো। কিন্তু বিশেষ জরুরি কাজে আমি পেলুম না। এই বিরাট বাড়ি আজ ফাঁকা। শুধু দেখলুম, ইসমাইল যথানিয়মে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে মুসলমান, আজ তার ছুটি নেই। পরিষ্কার করে সাজিয়ে রেখেছে আমার টেবিল। কাঁচের গেলাসে রয়েছে জল, নির্ভুল হিসেবে রয়েছে এক প্যাকেট সিগারেট। আজকের ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। কোট খুলতে আর ইচ্ছে হোলো না। ইসমাইলকে ডেকে বললুম, "এক কাপ চা আনতে পারো? যা ঠাণ্ডা!"

তার সেই টেরাকোটার মতো মুখ তুলে ইসমাইল বললো, "হ্যাঁ হুজুর। হামলোক কয়তা গুলাবি জাড়া!" বলে সে চায়ের খোঁজে বেরিয়ে গেলো। গুলাবি জাড়া! অর্থাৎ প্রথম শীতের আমেজ। যে-শীত কামড়ায় না, যে-শীতে সমস্ত শরীর শিরশির করে শিউরে-শিউরে ওঠে। ভালো লাগে। গুলাবি জাড়া! কতদিন আগে কোন বাদশা প্রথম এই কথা বলেছিলো কে জানে! কিন্তু আমি নিতান্ত নিরীহ একজন বাংলাদেশের লোক। আমাদের কাছে এই ঠাণ্ডাই পোষ-মাঘের চেয়ে কম নয়।

খানিক পরে ইসমাইল নিজেই বয়ে আনলো চায়ের ট্রে। চমৎকার গরম ধূমায়িত চা। সমস্ত মন খুসি হয়ে উঠলো। বললুম, "এতোটা চা তো একলা খেতে পারবো না। তোমার গেলাসটাও নিয়ে এসো।"

নিঃশব্দে গেলাস এনে ছায়ার মতো দাঁড়ালো ইসমাইল। তাকে চা দিলুম। নিজেও শেষ করলুম পেয়ালা। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ইসমাইলের সঙ্গে গল্প সুরু করলুম। তখনো সেই বিশেষ জরুরি কাজের দেখা নেই!

ইসমাইল সেই চায়ের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি তাকে নানা প্রশ্ন করে কথা বলতে উৎসাহিত করলুম। প্রথমে সে বিশেষ কোনো কথা বলতে চাইছিলো না। কিন্তু খানিক পরে তার যেন জড়তা ভাঙলো। সে অনেক কথা বললো। তার নিজের গল্পটি ছোট করে লিখলুম।

তার বয়স কত, সে জানে না। বললো: তিন-চার কুড়ি হবে। তার মাথার সমস্ত চুল পাকা আর সমস্ত শরীর যেন বজ্রদগ্ধ একটি গাছ। তাই মনে হয়, চার-কুড়ি না হলেও ষাটের উপর হওয়াই স্বাভাবিক। পাঞ্জাবের কোনো ছোটো গ্রামে এক চাষী পরিবারে তার জন্ম। মা-বাবার কথা মনে নেই। চাচির কাছে মানুষ। চাচির কিছু জমি-জমা আর গাই-গরু ছিলো। চাচি চাইতো ইসমাইল তাদের দেখাশোনা করে। কিন্তু ইসমাইলের তরুণ রক্তে ছিলো আগুন। লাঙল ঠেলার চেয়ে বন্দুক চালাতে, গরু চরানোর চেয়ে ঘোড়া হাঁকাতে সে অনেক বেশি পছন্দ করতো। কোন এক সায়েবের সুনজরে সে পড়ে। সায়েব মিলিটারিতে কাজ করতো। ইসমাইলকে করে নিলো নিজের অর্দালি। ভারি পছন্দ হয়েছিলো ইসমাইলের সেই সায়েবের কাছে কাজ করতে। সায়েব

দিয়েছিলো তাকে ভালো কাপড়, কাজ চালাবার মতো শিখিয়েছিলো ইংরিজি বলতে, আর শিখিয়েছিলো বন্দুক চালাতে। তার নিশানা ছিলো খুব ভালো, আর শরীর ছিলো ইস্পাতে গড়া। আর সাহস ? কোন পাঞ্জাবির না সাহস আছে ? তাই তার সায়েব যখনি যেতো বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে, সে-ও ছায়ার মতো সর্বদা থাকতো পিছনে ; পরনে খাকি-কোর্তা ও হাপপ্যাণ্ট,পিঠে ঝুলি আর হাতে দোনলা বন্দুক। অনেক শের তারা দুজনে মেরেছিলো, বহুবার বেঁচে গিয়েছিলো একেবারে ধ্রুব মৃত্যুর হাত থেকে।

এমন সময় একবার ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য সে নিজের গ্রামে ফেরে। চাচি বহুবার তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি। এবারে সেই বুড়ি কিন্তু সত্যি-সত্যিই বেঁধে ফেললো ইসমাইলকে। মেয়ে সে দেখেই রেখেছিলো, ইসমাইল দেশে ফিরতেই ঝপ করে বিয়ে দিয়ে দিলো। মেয়েটি ? অমন মেয়ে খোদা আর সৃষ্টি করেন নি। কী তার রঙ, কী তার গড়ন, কী তার স্বাস্থ্য ! দুরন্ত দুর্ধর্ষ ইসমাইল এক নিমেষে পোষ মেনে গেলো। ইস্তফা দিলো সায়েবের কাজে। সায়েব অনেকবার চিঠি দিয়েছিলো। শেষে জ্বালাতন হয়ে একদিন লেখাপড়া-জানা এক মাস্টারবাবুকে দিয়ে সে চিঠি লিখে দিলো ইসমাইল মরে গেছে। সায়েব সে খবর পেয়ে তার চাচিকে একশো টাকা পাঠিয়েছিলো আর ইসমাইল সে টাকায় বৌকে গড়িয়ে দিয়ে-

ছিলে চাঁদির অনেক গয়না।

মেয়েটা একেবারে তাকে বিগড়ে দিয়েছিলো : নইলে অমন দুর্দান্ত ইসমাইল কিনা হাসিমুখে গরু চরাতে যেতো আর ফিরে-ফিরে চাইতো? আর তাই না দেখে সেই বুড়ি চাচিটার মুখ টিপে সে কী হাসি!

—গতবার যখন যুদ্ধ সুরু হোলো, ততদিনে ইসমাইলের সংসারে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। ইসমাইলের ছেলেটা তখন বছর দশেকের। আর তার জরু? সে হুজুর বহুৎ সরম কি বাত। ছেলেটা জন্মাবার বছরখানেকের মধ্যেই—"নেই হুজুর মর্ গিয়া নেই, ভাগ গিয়া।"

"বল কি! ভাগ গিয়া?"

তার চোখের তারা দেখা যায় না। সেই টেরাকোটার মতো মুখ সামান্য বিকৃত হোলো কি হোলো না বোঝা গেলো না একটা ফাঁকা গলায় ওই কটা কথার প্রতিধ্বনি করে সে খানিক চুপ করে রইলো।

তারপর ইসমাইলের গ্রামে থাকতে ভালো লাগতো না। তার চাচি বারবার বলেছিলো আর একটা বিয়ে করতে। কিন্তু বুড়িকে সে ধমকে সিধে করে দিয়েছিলো, বলেছিলো ও-কথা আবার বললে বুড়িকে আর নিজের ছেলেকে গলা টিপে মেরে নিজে ফাঁসি যাবে। আবার সে চাকরির খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু চাচি বললো যদি আবার সে চাষবাস ছেড়ে চলে যায় তা হলে বুড়ি

মরবে গলায় দড়ি দিয়ে, তখন বাচ্চাটার কী হাল হবে? কার কাছে থাকবে? ফলে ইসমাইলের আর গ্রাম ছাড়া হোলো না।

কিন্তু গতবার যখন সে দেখলো দলে-দলে গ্রামের লোকেরা খাকি-কুর্তা পরে ভুট্টার সবুজ ক্ষেতের পাশ দিয়ে ড্রাম বাজিয়ে মিলিটারি হয়ে গেলো, সে আর স্থির থাকতে পারলো না। তার শিকারী তাজা রক্ত ফুটে উঠলো। সে-ও চলে গেলো লড়াই করতে। চাচি কত কাঁদলো কিন্তু ইসমাইলের বারবার মনেপড়তে লাগলো একটা কচি মেয়ের মুখ; অমন মেয়ে খোদা আর বানান নি! আর যত মনে পড়তে লাগলো ততই খুন দেখবার আর খুন করবার রোখ যেন তার বাড়তে লাগলো।—কত জায়গায় সে লড়লো। কখনো মেসোপটেমিয়ায়, কখনো ইজিপ্টে। কত দেশ সে দেখলো; এমন কি ফরাসি দেশ পর্যন্ত! যুদ্ধের নেশা তাকে পাগল করে তুলেছিলো। তার চাচি, তার ছেলে—এমন কি সেই সুন্দর মেয়েটাকে পর্যন্ত সে ভুলে গিয়েছিলো। কারুর খবর সে রাখতো না, কারুর খবর সে চাইতো না। বেশ ছিলো। অত তাড়াতাড়ি লড়াই না থামলে সে খুসিই হোতো!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "এ কী কথা? সত্যি?"

জোরে-জোরে ঘাড় নেড়ে সে বললো, "হাঁ হুজুর! জরুর।"

দেশে ফেরবার সময় তার মন তো রীতিমতো খারাপ হয়ে গেছে! শেষে একদিন সে পৌছলো নিজের গ্রামে। ভেবেছিলো চাচি আর বাচ্চাটা তাকে দেখে খুসি হবে। কিন্তু কোথায় সেই

বুড়ি ? কোথায় তাদের ঘর-বাড়ি, গরু-মোষ ? এই ক-বছরে ইসমাইলের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। লড়াই করতে-করতে পাক ধরেছে তার জুলপির চুলে। রোদে পুড়ে রঙ হয়েছে ঝামার মতো। গ্রামের লোকেরা তো চিনতেই পারেনি। আর গ্রামেই বা লোক কোথায় ? অর্ধেক লোক তো লড়াই থেকে ফেরেনি বাকি অর্ধেকের মধ্যে কে-কোথায় ছিটকে পড়েছে তা খোদাই জানেন !

শেষে বহু কষ্টে একটা চেনা লোক বেরুলো, আর সেই লোকটা বহু কষ্টে চিনলো ইসমাইলকে। তার কাছ থেকেই সে শুনলো, তার চাচি গেছে মরে আর বাচ্চা ছেলেটি লায়েক হয়ে কোথায় যেন ভেগেছে। হয়তো সে লাহোরে দিন গুজরান করে কুলিগিরি করে, নয়তো দিল্লিতে হাঁকাচ্ছে টাঙা।

সেইদিনই ইসমাইল নিজের জমিজমা আর পোড়ো বাড়িটা বেচে চলে এলো দিল্লি। আর মনে-মনে বললো ভালোই হয়েছে। এতোদিন লড়াই করে তার বেশ কিছু টাকা জমেছে। সেই মেয়ে-টাকেও এসেছে ভুলে। এইবার দেখেশুনে আর একটা বিয়ে করে সে সংসার পাতবে—আর বাকি জীবনটা কোনো সরকারি কাজ করে নিশ্চিন্ত মনে কাটিয়ে দেবে।

১৯১৯ সালে নভেম্বর মাসে সে দিল্লি আসে। চাকরির খোঁজে একদিন সে টিমারপুরের দপ্তরের সামনে ঘোরাঘুরি করছে ; এমন সময় দেখলো মোটরকার থেকে নামছে তার পুরানো মনিব সেই সায়েব, যার কাছে ইসমাইল প্রথম কাজ

করতো। পনেরো বিশ বছর পরে সায়েবের সঙ্গে দেখা, অথচ চিনতে ইসমাইলের এক মিনিটও লাগেনি। সায়েবের চুলগুলো শুধু শাদা হয়েছে, আর সামনের দিকে টাক পড়েছে। কিন্তু তার বাঁ-দিকের গালের উপরকার বাঘের থাবার দাগটা মিলিয়ে যায়নি। একটুও ইতস্তত না করে ইসমাইল সোজা ছুটলো সায়েবের কাছে, তারপর সসম্ভ্রমে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বললো: "সেলাম হুজুর।"

সায়েব চিনতে পারেনি। বললো, "কোন হ্যায় ?"

"হাম ইসমাইল হুজুর।" তারপর ইংরেজিতেই সে দিলো তার পরিচয়।

সায়েব চশমাটা পরিষ্কার করে খুব ভালো করে তাকে নিরীক্ষণ করে বললো: "বাই জোভ! ডেভিল টেক মি! আরে তুম তো মর গিয়া থা।"

সেই সায়েবই দপ্তরের কাজে তাকে লাগিয়ে দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই পেনসন নিয়ে বিলেতে চলে গেলো। তখন থেকেই ইসমাইল থেকে গেলো দিল্লিতে জুম্মা মসজিদের কাছে একটা ছোট্ট হোটেল-বাড়ির এক কোণের ঘরে।

এমনি করে আরো বছর পাঁচেক কাটলো। সে আপিস করে বেড়িয়ে বেড়ায়, সিনেমা দেখে আর মাঝে-মাঝে দারু খায়। কিন্তু সাদি করা আর হয়ে ওঠে না। সে তো তখন আর বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করতে পারে না, ইতিমধ্যেই তার সমস্ত চুল প্রায়

পেকে গেছে। তাকে প্রত্যহ কলপ মাখতে হয়। তবু হয়তো ছুটি নিয়ে গ্রামে গেলে কোনো বড়সড় মেয়ে খুঁজে বার করা যেতো। কিন্তু সেই চাচির গ্রামে আর তার ফেরবার ইচ্ছে করতো না।

এই রকমে পাঁচ বছর কাটিয়ে দেবার পর একদিন সে শুনলো আপিসের জমাদারের এক বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে আছে। লোকটা খুব কৃপণ আর মেয়েটা দেখতে ভালো নয় বলে এতোদিন বিয়ে হয়নি। শুনেই ইসমাইল ছুটলো তার কাছে। এই তো তার মনের মতো পাত্রী। দেখতে ভালো নয় তো কী হয়েছে? রূপে আর তার দরকার নেই। সব ঝুট হ্যায়। একটি কুরূপা অথচ স্নেহশীলা জরু পেলেই সে তখন বেঁচে যায়। বাকি জীবনটা চারপাইতে হাত-পা মেলে দিব্বি কাটিয়ে দিতে পারে।

জমাদার তার কথা শুনে খুব খুসি হোলো এবং তাড়াতাড়ি বিয়ের একটা দিন ঠিক করে ফেললো। ঠিক হোলো তারা দুজন ছুটি নিয়ে যাবে জমাদারের গ্রামে এবং সেইখানেই সাদি করে বৌ নিয়ে ফিরে ইসমাইল হোটেল ছেড়ে একটা বাসা নিয়ে থাকবে দিল্লিতে।

অনেক ঘোরাঘুরি করে সে এক ছোটো বাড়ি ভাড়া করে ফেললো পাহাড়গঞ্জের এক ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে। তার জমানো টাকা ভেঙে ইসমাইল অনেক জিনিস সওদা করলো:

চারপাই আর দরি, বিছানা আর রেজাই, এমন কি আয়না আর স্নো-পাওডার পর্যন্ত।

তারপর—সেদিন জুম্মাবার। শীতকাল। আপিস থেকে ফিরে বেশ ভালো করে সাজগোজ করে ইসমাইল চললো তার সান্ধ আড্ডায়। রাত এগারোটায় গোস্ত-রুটি খেয়ে আর গলা পর্যন্ত মদ গিলে সে যখন আড্ডা ছেড়ে বেরুলো তার পা তখন টলছে, শরীরটা হালকা হয়ে গেছে, আর মনে দারুণ ফুর্তি। কিছুটা পথ যাবার পরেই তাকে ধরলো এক দালাল। কিছুতেই ইসমাইলকে সে ছাড়লো না। বললো, কাশ্মীরী গেটের ওপাশে একটা হুরির মতো সুন্দরী মেয়ে আছে। সেখানে নিয়ে তাকে যাবেই। ইসমাইলের তখন মাথার ঠিক নেই। আর আকণ্ঠ সরাব পান করে দিল তার বেজায় দরাজ হয়ে গেছে। সে বেশি আপত্তি করলো না। একটা টাঙায় বসে পড়লো আর গান গাইতে-গাইতে পৌঁছলো সেই বাড়ির সামনে।

হুজুর! ভিতরে গিয়ে দেখি খাটিয়ায় হুরি সেজে যে-মেয়েটা বসে আছে সে আমারই জরু—হুরি সেজে বসেছে। আর সেই টাউট—ইয়া আল্লা, সেটা আমারই ছেলে! ছেলেটার গাল ভেঙেছে, চোখ বসেছে, নেশা করেছে। আর হুজুর, আমার সেই জরু বিয়ার গিলে আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। গলার আওয়াজটাও বদলেছে। নেশা করে কাছে গেলে তখনো তাকে হুরি বলে মনে হয়।

রুদ্ধ নিশ্বেসে প্রশ্ন করলুম, "তারপর ?"

তারপর ? সে যে কী করে বেরিয়ে এলো জানে না। হ্যাঁ, আসবার আগে তাকে গোটা দশেক টাকা দিয়ে আসতে হয়েছিলো। তবে আল্লার বহুৎ মেহেরবানি, তারা কেউ ইসমাইলকে চিনতে পারেনি। কত দিন পরে দেখা, চিনবে কী করে ?

রাস্তায় নেমে ইসমাইল দেখলো তার নেশা সম্পূর্ণ ছুটে গেছে। ছুটলো সে সোজা তাড়িখানায়। সমস্ত রাত ধরে সরাব গিললো। কতবার বমি করলো, তবু ছাড়লো না। নেশা তাকে করতেই হবে। কিন্তু সরাবে আর তার নেশা হোলো না। সকালে সে যখন বাড়ি ফিরলো তখন শুধু ভয়ানক অসুস্থ। কিন্তু নেশা তার হয়নি। সকালের আলোয় পৃথিবীকে দেখে তার মনে হোলো ঝুটা, মানুষগুলোকে দেখে মনে হোলো ঝুটা, নিজেকে দেখে মনে হোলো ঝুটা।

সেই থেকে সরাব ছেড়ে দিয়ে আফিং ধরেছে। চমৎকার একটা ঝিমুনি আসে আফিং-এ। সরাবে কিছুই হয় না। আর জমাদারের মেয়েকে বিয়ে ? তার টেরাকোটার মুখে এই প্রথম হাসি দেখলুম। আমার প্রশ্ন শুনে সে হাসছে। বললো, "নেই হুজোর ! আউর সাদি নেই কিয়া।"

ইতিমধ্যে সেই অতি-জরুরি কাজটা এসে গেলো। এক রাশ কাজ। মাথা গুঁজে তখনি লেগে গেলুম। ঘাড় গুঁজে

করে গেলুম সেই কাজ। যখন শেষ হোলো বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। আড়মোড়া ভেঙে টেবিল ছেড়ে উঠলুম। বাইরে বেরিয়ে দেখি ইসমাইল টুলের উপর ঝিমোচ্ছে। তার মাথাটা নেমে এসেছে বুকের উপর। অস্পষ্ট আলোয় ভালো করে দেখা যায় না।

চোর

একে সোনার ঘড়ি, তার উপর জামাইয়ের। এমন জিনিস বাড়ি থেকে উধাও হওয়া একটা সামান্য কথা নয়। হাকিম-বাড়ির কুকুর-বেড়ালটা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

দুপুর বারোটা পর্যন্ত কমল চিঠিপত্র লিখছিলো। বারোটা থেকে একটা স্নানাহারে কাটা'র পর ঘরে এসে দেখে ঘড়িটা নেই। প্যাড যে-রকম খোলা তেমনি রয়েছে, খাম পোস্টকার্ড যেমনটি ছড়ানো ছিলো তার থেকে এক চুল নড়েনি, এমন কি পার্কার ফিফ্‌টি ওয়ানটা পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করেছে বলে মনে হোলো না। কিন্তু সেই কলমটার পাশে যে-রোলেক্স ঘড়িটা ছিলো ভোজবাজির মতো সেটা যেন উবে গেছে।

"কী কেলেঙ্কারী বল দিকিনি ডলু।" হাকিম-গিন্নি পাশের ঘরে তাঁর মেয়েকে বললেন, "একে আসে না, দুদিনের জন্যে যদি বা এলো, তার ঘড়ি চুরি? ছি-ছি, লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার।"

"সত্যিই তো," চিরুনির উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁথেয় সরু করে সিঁদুরের রেখা টানতে-টানতে ডলি বললো, "মুখের কথা নাকি

একটা ঘড়ি যাওয়া! রোলেক্স, আটশো-হাজার দাম। বললেই হোলো পাওয়া যাচ্ছে না! বাড়ির চাকর-বাকরদের কাণ্ড নিশ্চয়ই, তোমাকে বলে দিলুম।"

তারপর ভিজে চুলগুলো পিঠে এলিয়ে কমলের ঘরে এসে বললো, "কী, গেছে তো! কতদিন বলেছি ও-রকম কেয়ারলেস হোয়ো না, পৃথিবীর সবাইকে মনে কোরো না সাধু পুরুষ। সেদিন মানি-ব্যাগটা হারালে, আজ ঘড়ি।"

ক্ষীণ স্বরে কমল বললো, "মানি-ব্যাগটা যদি পিক-পকেট না হয়ে থাকে, তা হলে হারিয়েই ছিলুম সম্ভবত। কিন্তু ঘড়িটা—এটা ঠিক হারানো নয়। স্নানের ঘরে যাবার আগে ঠিক এইখানটায় রেখে গেছি," বলে আঙুল দিয়ে কলমের পাশটা দেখালো। "ফিরে দেখি নেই। ঠিক হারানো নয়, চুরিই গেছে। কেউ নিয়েছে।"

জানালার পাশেই টেবিল। রেশমের হালকা জালি-পর্দা, পিছনে লোহার গরাদ। একতলা বাংলো-বাড়ি, অনায়াসে বাইরে থেকে হাত গলিয়ে টেবিলের উপরকার ঘড়িটা কেউ হাতিয়ে নিতে পারে।

"বাড়ির কেউ নিলো না বাইরের লোক?—চলো তো বাইরেটা একবার দেখি। বাইরের লোক হলে জানলার পাশে নিশ্চয়ই পায়ের ছাপ থাকবে। কাল রাতেই বৃষ্টি হয়েছে, মাটি এখনো নরম।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডলি, তার

পিছনে এলো কমল। বাড়ির ঝি-চাকর-বামুন দরজার কাছে ভিড় করেছিলো। কমলের পিছন-পিছন তারাও বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বাড়ির এলাকার মধ্যে লাল-কাঁকর ছড়ানো পথ। গাড়ি-বারান্দার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে সমস্ত বাড়িটাকে ঐ পথ যেন প্রদক্ষিণ করেছে। সেই পথের উপর মচমচ শব্দ তুলে ডলি আর কমল জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। পথের পাশেই সরু ফালি জমিটায় গাঁদা আর সূর্যমুখীর গাছ। রাত্রির বৃষ্টিতে ধুয়ে গাছগুলো উজ্জ্বল সবুজ। গাঁদার ফুল ফোটার সময় এখন নয়, হলদে-হলদে বড়-বড় সূর্যমুখী শুধু ফুটেছে। তলার জমিটা ভিজে।

সেই ভিজে জমিটা নীচু হয়ে বসে ভালো করে ডলি পরীক্ষা করতে লাগলো। "এই তো, এই তো পায়ের ছাপ!"

নিধি দশ এগারো বছরের পুরনো চাকর। ইতিমধ্যে সে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। বললো, "সকালে নালি পরিষ্কার করতে জমাদার এসেছিলো। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে সে হেঁটেছে, আমি দেখেছি। আমিই জল ঢালছিলুম কিনা।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে ডলি বললো, "ঠিক হয়েছে। আমি বলিনি জানলা গলিয়ে কেউ নিয়েছে? ঠিক ঐ জমাদারটারই কাণ্ড।" ডলির চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

কাঁকরের উপর আবার মচমচ শব্দ শুনে ডলি চোখ ফেরালো। আগন্তুক শীর্ণ কঙ্কালসার একটি প্রৌঢ়, মাথার চুলগুলো সমান করে ছাঁটা, গালের উপর ফাঁক-ফাঁক খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, সহজেই গোণা যায়; সমস্ত শরীর খালি, কোমরে শুধু ছেঁড়া ময়লা এক টুকরো কাপড়। হাতে ঝাঁটা না থাকলে সহজেই পথের ভিখিরি বলে মনে হোতো। ডলির মা-র বাপের বাড়ির আমলের সে পুরনো চাকর। এ-বাড়ির সবাই তাকে ডাকে বুড়ো পঞ্চা বলে।

এই পঞ্চাকে নিয়ে বাড়ির সবাইকার কৌতুকের শেষ নেই। ডলির বাবার একটি সুপরিচিত ঠাট্টার কথা এ-বাড়ির সবাই জানে। প্রায়ই তিনি বলেন, "আমার বিয়েতে যৌতুক হিসেবে শ্বশুরমশাই বুড়ো-পঞ্চাকে দিয়েছিলেন।" বাড়িতে যে-কেউ আসে এই বুড়ো-পঞ্চাকে না দেখিয়ে এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া ঐ যৌতুকের কথাটা না শুনিয়ে তিনি ছাড়েন না। কাছারি-ক্লাব এমন কি বাজারেও হাকিম সায়েবের এই কৌতুকের কথাটা জানতে কারুর বাকি নেই।

লোকটা আধ-পাগলা। এতো বয়স হোলো তবু জিভের আড় ভাঙেনি। ছোটো ছেলেদের মতো আধো-আধো ভাঙা-ভাঙা কথা বলে, ভয় দেখালে ভয় পায়। তার একমাত্র বাতিক ঘর-ঝাট দেওয়া। সর্বদাই তার হাতে ঝাটা। কেউ বেড়াতে এলেই ঝাঁটা নিয়ে ঘরে সে ঢকবেই মেঝে পরিষ্কার করার জন্য।

ডলির মা-বাবা বকে ধমকে হায়রান হয়ে গেছেন। বেশি বকলে ছোটো ছেলের মতো হাউ-হাউ করে কাঁদে। কিন্তু স্বভাব বদলায় না।

কমলকে পঞ্চার ভারি পছন্দ। বাড়ির অন্য চাকর-বাকররা কমলকে জামাই বলে সমীহ করে, সে ভালোবাসে মানুষ বলে। সবাই পঞ্চাকে নিয়ে হাসি-তামাসা করে, কিন্তু কমলের ঘরে ঝাঁটা নিয়ে ঢুকলেই সে হেসে কথা বলে, কিছু করার না থাকলে খানিক গল্পও করে, মাঝে-মাঝে সিগারেটও দেয়। ভারি খুসি হয় পঞ্চা। এই তামাকের নেশা ছাড়া তার জীবনে অন্য কোনো নেশা নেই। এ-বাড়িতে সে মাইনে পায় না, মাইনের বদলে বাজারের সঙ্গে তার জন্য দু পয়সার তামাক বরাদ্দ। তার প্রধান সম্পত্তি একটি ডাবা-হুঁকো আর মাটির কয়েকটা কল্কে। সেগুলোর উপর যত্নের তার শেষ নেই। দুপুরে কিছু দূরের চাকর মহলে অন্যান্য চাকররা যখন ঘুমোতে কিংবা তাস পিটতে ব্যস্ত, পঞ্চা তখন তাদের ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে খুব ভালো করে তামাক সেজে এক চোখ বন্ধ করে বুক ভরে ধোঁয়া টানে, যতক্ষণ পারে ফুসফুসের মধ্যে চেপে রাখে সেই ধোঁয়া, তারপর খুব ধীরে-ধীরে ঠোঁট দুটো ছুঁচোর মতো করে সূতোর মতো সরু ধোঁয়া ছাড়ে। সে-সময় সে কারুর নয়, শুধুই তামাকের। কেউ তখন ডাকলে সে গ্রাহ্যই করবে না, ঠেলা দিলে তেড়ে মারতে আসবে।

ঘড়ি চুরির কথাটা কানে যেতে ঘর-ঝাঁট বন্ধ করে হাতে ঝাটা নিয়ে সে এগিয়ে আসছিলো। ডলিকে মুখ ফেরাতে দেখে বললো, "কী কাণ্ড দিদিমণি, জামাইবাবুর ঘড়ি নোকে নিয়ে পালিয়েছে?" তারপর মাথা নেড়ে খুব বিজ্ঞের মতো বলতে লাগলো, "বেছ ব্যাবছা ছুরু করেছে নোকে। ঘড়ি চুরির ব্যাবছা।"

ডলির শ্বশুরবাড়ি থেকে কালি-ঝি এসেছিলো খুকির জন্য। মাঝ-বয়সী, পরিষ্কার শাড়ি ব্লাউজ, মিশকালো রঙ, দোক্তা-খাওয়া পানের ছোপপড়া দাঁত। নিজেকে বলে সে খুকির আয়া। ইতিমধ্যেই এ-বাড়ির চাকরমহলে তাকে পান-দোক্তা সরবরাহ করার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা পড়ে গেছে। সবাইকেই কালি তার হাসি বিতরণ করে। বনে না শুধু পঞ্চার সঙ্গে। ডলির ঝুমকো-চুলো ফরসা মোটাসোটা মেয়েটা এখানে এসেই অস্বাভাবিক রকম পঞ্চার ভক্ত হয়ে পড়েছে। পঞ্চাকে দেখলেই কালির ফরসা শাড়ি-পরা কোল ছেড়ে গা-খালি ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-পরা পঞ্চার কোলে আসার জন্য ছটফট করে। পঞ্চার কোলে না-ওঠা পর্যন্ত থামবে না, ক্রমাগত কাঁদবে। পঞ্চাও পোষা কুকুরের মতো খুকির ভক্ত হয়ে পড়েছে। কালি-ঝি না ছাড়লে যা মুখে আসে তাই বলে সে গালাগালি করে, তারপর খুকিকে কোলে তুলে নেচে, আবোল-তাবোল ছড়া বলে বাড়ি মাত করে রাখে। এক মাথা ঝুমঝুমে চুল নাড়িয়ে

খুকিও পঞ্চার সঙ্গে হেসে গড়াগড়ি যায়। এতোবড় সবাক খেলবার পুতুল ইতিপূর্বে বাবলি কখনো পায়নি।

পঞ্চার কথা শুনে অন্যান্য চাকররা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। কালি-ঝি তাদের পিছন থেকে চাপা গলায় মুখ-ঝামটা দিয়ে বললো, "মরি-মরি, চড়কের সঙ।

ডলি পঞ্চাকে দেখেও দেখলো না। কমলও পঞ্চার কথা শুনেও শুনলো না। সে তখন ডলিকে বোঝাতে ব্যস্ত, "জানলা গলিয়ে জমাদারই যদি ঘড়িটা নেয় তা হলে ঘড়ির পাশের কলমটা নিলো না কেন? কলমটাও তো গোল্ড-ক্যাপ্ড্ পার্কার।"

"তাড়াতাড়িতে নিতে পারেনি আর কি। হয়তো কেউ তখন এদিকে আসছিলো। প্রথম খাবলে যা উঠেছে তাই তুলেই ভেগেছে জমাদার।"

"কিন্তু না, জমাদার নিতেই পারে না। সকালে ঘড়ি পরেই তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, মনে নেই? যখন বেড়িয়ে ফিরলুম তার আগেই জমাদার চলে গেছে। তারপর ঘর থেকে তো বেরুইনি। চিঠিপত্তর লিখছিলুম। ঐ ঘড়িটাতেই বারোটা বাজতে দেখে স্নান করতে উঠি।"

খুব চিন্তিত মুখ করে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ডলি বললো, "হ্যাঁ, ঠিক। এটা খেয়াল হয়নি। কিন্তু আমরা ফেরার পর তো বাইরের লোক আর কেউ আসেনি।'

ডলির মা কথা শুনতে পেয়ে বললেন, "আসেনি কীরে? কেন, সেই ফিরিয়ালা?—তোর কী যেন হয়েছে আজকাল! কোনো কথা যদি মনে থাকে!"

সত্যিই তো। কী যেন হয়েছে ডলির। তার ভাবী বাচ্ছাটার জন্য কত রকমের ছিট আর পপলিন তার মার সঙ্গে পছন্দ করে সে কিনলো আর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বেবাক ভুলে গেছে! কমল বলছে বারোটা থেকে একটার মধ্যে চুরি গেছে। ক'টার সময় ফেরিওলারা এসেছিলো?—মনে পড়ছে, দূরের ইস্কুলের পেটা-ঘড়িতে সবে তখন বারোটার শেষ ঘণ্টাটা থেমেছে; কমলকে স্নানের তাড়া দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে ফিরিলাদের সে ডেকেছিলো। খাওয়া শেষ করে জলের ঘর থেকে একটা বাজার ঘণ্টা শুনে কমল রাগ করছিলো: ডাক্তার ডলিকে বারোটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম নিতে বলেছে—কমল আবার তাকে ডাক্তারের নির্দেশ মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। তারা খাবার ঘরে যাবার পরেও কি ফেরিওলারা ছিলো? তাদের জানালার পাশ দিয়ে ফেরিওলাদের কেউ কি হাঁটাহাঁটি করেছে?

শেষের প্রশ্ন দুটির উত্তর পাওয়া গেলো নিধির কাছে। তারা খেতে যাবার পর কাপড়ওলারা গাঁঠরি বাঁধতে শুরু করে, তারপর তাদের চারজনের মধ্যে হাফপ্যাণ্টপরা যে-ছোকরা ছিলো নিধির কাছে সে খাবার জল চায়। কমলের ঘরের পাশ

দিয়ে নিধি তাকে বাড়ির পিছনে রান্নাঘরে নিয়ে এসে ঘটি করে জল ঢেলে দিয়েছে।

"তারপর কী করলি ?" ব্যাগ্র হয়ে ডলি প্রশ্ন করলো।

"তারপর আমি তো আর কিছু করিনি দিদিমণি। আমি এঁঠো বাসনগুলো তুলতে গেলুম—"

"আর সেই ছেলেটা একলা জামাইবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে ফিরে গেলো।" রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে ডলির মা নিধির কথাটা সম্পূর্ণ করলেন। "এই না হলে বুদ্ধি! পইপই করে বাবু বলেছেন বাইরের লোককে ঘরে ঢোকাসনি, কোনদিন বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যাবে। ওই সব ফিরিওলা সেজে তারা বাড়ির আটঘাট দেখে যায়। ও-ছোঁড়াটাই হাত গলিয়ে ঘড়িটা নিয়ে পালিয়েছে। যা ছুটে কাছারি, এখনি বাবুকে খবর দে। বল, মা সব কাজ ফেলে এখনি আসতে বলেছেন।"

হাতে ঝাঁটা নিয়ে পঞ্চা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিলো। কী বুঝছিলো ভগবানই জানেন। আবার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়ে সে বললো, "নিচ্চয়। ও-ছোঁড়াটাই নিয়েচে।" সে তার দিদিকে, অর্থাৎ ডলির মাকে যমের মতো ভয়-ভক্তি করে। তার দিদির যে অনেক বুদ্ধি এবং তিনি যে কখনো ভুল কথা বলতে পারেন না পঞ্চার এটা ধ্রুব বিশ্বাস।

বাড়িতে চুরি হলেই যে দারোগা আসে এবং চাকরবাকরদের যে প্রচণ্ড মারধোর করে নিধিরা সবাই একথা জানে। 'বাবুকে

ডেকে আনার কথায় তাদের বুক দুরদুর করে উঠলো। জামাই-বাবুর ঘড়ি চুরি—আজ পুলিসের হাতে তাদের না জানি কী দুর্গতিই হবে। তবু যতটা সুনজরে থাকা যায়—নিধি প্রাণপণ করে দৌড় দিলো।

একমাত্র কোনোরকম চিত্তবিকার নেই পঞ্চার। সে আবার উবু হয়ে বসে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করলো। মাঝেমাঝে কেবল বলে, "কী ছাব্বোনাচ, জামাইবাবুর ঘড়ি চুরি—এঁ্যা? ভালো ব্যাবছা নোকে ধরেছে।—নিচ্চয় ও ছোঁড়াটা নিয়েচে।"

"অ বুলো পঞ্চা, পঞ্চা—" কালি-ঝি বাবলিকে কোলে নিয়ে বারান্দায় এসেছিলো। দরজার ফাঁক দিয়ে পঞ্চাকে বাবলি দেখতে পেয়েছে। পঞ্চার কাছে আসার জন্য তাই সে যথারীতি ছটফট শুরু করেছে।

বাবলির গলা শুনে ঝাঁটা ফেলে ধূলোর হাত নিজের ময়লা কাপড়টায় মুছতে-মুছতে পঞ্চা উঠে দাঁড়ালো। "—এই যে দিদিমণি, এচো এচো।"

বাবলি থেকে আরম্ভ করে বাবলির দিদিমাকে পর্যন্ত পঞ্চা দিদিমণি বলেই ডাকে। মাঝেমাঝে বাবলিকে আজকাল সে খুকুদিদি বলে।

কালি বললো, "যা মিন্সে, পালা। এতটুকু আক্কেল তোর নেই? ধূলো-হাতে খুকুকে নিয়েছিস দেখতে পেলে মা তোকে আস্ত কুটবে।"

হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে পঞ্চাও রেগে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, কুটবে! তোকে বলে গেছে।—বলে দিদিকে কত ধূলোকাদা মেকে কোলে নিয়েচি, দিদিমণিকে কত কোলে নিয়েচি—আর আজ বকবে—এচো খুকুদিদি, তোমাকে বেড়া কত্তে নিয়ে যাই।"

"মর মিন্সে, আমাকে ছুঁসনি।"

"আমি কেন মরবো, তুই মর মাগী। তোর নাল দাঁতগুলো ছিরকুটে আকাচের দিকে চেয়ে খাবি খেয়ে-খেয়ে মর।"—শুনে-শুনে অনেক গালিগালাজ পঞ্চাও তার এই প্রৌঢ় জীবনে সঞ্চয় করেছে। "তুমি ছুনো না খুকুদিদি। এচো, আমার কোলে এচো।" বলে প্রায় এক রকম ছিনিয়েই বাবলিকে নিজের বুকের মধ্যে পঞ্চা টেনে নিলো।

কালির পান ফুরিয়েছে। তা ছাড়া এই চুরির ব্যাপার নিয়ে চাকর মহলে কী সব আলোচনা হচ্ছে জানবার জন্য ছটফট করছিলো কালি। তাই বিশেষ আপত্তি না করে বাবলিকে তার কোলে দিয়ে সে চলে গেলো। যাবার সময় নিতান্ত অভ্যেস দোষেই আবার বলে গেলো, "মর মর, তুই মর মিন্সে।"

ভারি কথা বলতে শিখেছে মেয়েটা। নতুন কথা শুনলে সঙ্গে-সঙ্গে সেটা বলা চাই। মৃত্যু সম্বন্ধে এতোদিন কোনো কথা সে শোনেনি। 'মর' কথাটা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে তার ভারি

পছন্দ হয়ে গেলো! পঞ্চার গলা জড়িয়ে এক মুখ হেসে সে বললো, “বুলো পঞ্চা, তুই মর।”

“খুকুদিদি কত কথা শিকেচে!” বলে পঞ্চা হাসতে লাগলো। “আমি একন মরবো না খুকুদিদি। তোমার বিয়ে হবে, তোমার ছঙ্গে আমিও ছছুরবাড়ি যাবো। আমাকে তারা কত তামুক খেতে দেবে—”

“আমি তামুক খাবো,” বাবলি বলে উঠলো।

এখনো চাকরদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি। অন্যদিন এই সময় পঞ্চা তামাক খায়। তামাকের কথায় তার কোটরগত চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। কড়া তামাকের সেই গলা-জ্বালা-করা অনুভূতি, ফুসফুসের মধ্যে দম বন্ধ করে সেই ধোঁয়া চেপে থাকা, মাথার ভিতরটা সেই টান-টান হয়ে যাওয়া আর সমস্ত পৃথিবীটাকে বেজায় হালকা আর সহজ আর মজার মনে হওয়া। তামাকের কথাতেই পঞ্চার যেন নেশা ধরে গেলো।

“খুকুদিদি, তোমার বাবুকে বলো অনেক-অনেক তামাক দিতে, রাচি-রাচি তামাক দিতে, বস্তা-বস্তা তামাক দিতে। কল্কেয় ভরে টিকেয় আগুন দিয়ে গুড়ুক-গুড়ুক করে খাবো আর তুমি দেকবে। সে বাবা কত ধোঁয়া—আমার মুক দিয়ে কেবল ধোঁয়া বেরুচ্চে। আমি তামাক খাচ্চি আর ছছুর বাড়িতে খুকুদিদি আমার পাচে বচেবচে কেবল দেখচে—”

"অ বুলো পঞ্চা, আমি তামাক খাবো—" যা শোনে বাবলির তা-ই বলা চাই।

উৎসাহিত হয়ে পঞ্চা বলে চললো, "তামাক খাবে বৈকি খুকুদিদি। ছচুরবাড়িতে বসে ক—ত তামাক খাবে। তোমাকে তারা কত ভালো বাচবে। আমি তোমার পাচে বচে থাকবো —আমাকেও তামাক দেবে। তোমাতে আমাতে বচেবচে দিনরাত তামাক কাবো—"

ডলির বাবা নিধির সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এলেন। বিরাট পুরুষ, কথা বললে চারিধার গমগম করে। জামাইয়ের ঘড়ি চুরি যাওয়া একটা সহজ কথা নয়। সমস্ত মুখ তাঁর থমথম করছে। যেন এই মুহূর্তে সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে একটা দারুণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তছনছ করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবীকে।

বাড়ির সব ঝি-চাকরকে ড্রয়িং-রুমে ডেকে তিনি বললেন, "কেউ এ-ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়েছি। এখনি দারোগা আর ইন্সপেক্টর সায়েব আসবেন। তোমাদের খানা-তাল্লাস হবে। ঘড়িটা এখনো বার করে দিলে কিছু বলবো না। না দিলে পুলিশের মার তোমরা তো জানো না—"

"হেই কত্তাবাবু, সত্যি বলছি নিইনি," হাউ-মাউ করে উঠলো নিধি। "আমি এতোদিন আছি, কক্ষনো একটা কুটো পর্যন্ত হারায়নি বাড়ি থেকে—"

ডলির বাবার এক ধমকে নিধি ঢোক গিলে চুপ করলো।

"এমন জানলে বাপু কে আসতো," ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে কাঁদতে-কাঁদতে আঁচলে কালি চোখ মুছতে লাগলো। ডলি ধমকে উঠলো তাকে। মাগীটার হাবভাব ভালো নয়। চাকর-বাকরদের সঙ্গে কেবল ফষ্টিনষ্টি। ভেবেছে বুঝি ডলির চোখে ধূলো দেবে। এবার নির্ঘাৎ তাকে দূর করবে ডলি।

অন্যান্য চাকর-বামুনরা ভয়ে কেউ আর কোনো কথা বলতে সাহস করলো না। বারান্দা থেকে শুধু পঞ্চার কথা আর বাবলির হাসির রেশ শোনা যেতে লাগলো।

"তোমার বাবুকে বলো একটা ঘোড়ার বাচ্চা কিনে দিতে—"

"ও বাবুয়া, একটা ঘোড়ার বাচ্চা কিনে দাও না—" বাবলির কচি গলার স্বর।

"সেই ঘোড়ার বাচ্চায় চেপে আমি আর খুকুদিদি টগবগ টগবগ করে ছুচুরবাড়ি যাবো। কত তামুক খাবো—"

"অ বুলো পঞ্চা, আমি ছুচুরবাড়ি যাবো, আমি তামুক খাবো—" এতো কথা বলতে শিখেছে মেয়েটা! যা শুনবে তা-ই বলা চাই। কী পরিষ্কার উচ্চারণ। কতবার ডলি আশ্চর্য হয়ে কমলকে ডেকে-ডেকে মেয়েটার পাকা-পাকা কথা শুনিয়েছে। আড়াই বছরের ক্ষুদে মেয়ে তো নয়, যেন একটা পাকা-কথার ঝুড়ি, বুড়ি।

আজ কিন্তু তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এই চুরির আবহাওয়া অতিক্রম করে তারা অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের নাগাল কেউ পাবে না।

একে-একে দারোগা এলো, পুলিশ সায়েব এলো। দশবার করে কমলের ঘর আর টেবিল আর জানালা পরীক্ষা হোলো। ডায়েরি লেখা, ফেরিওলা ধরার জন্য কনেস্টবল পাঠানো, চাকরদের জিনিসপত্র খানাতল্লাস, জেরা, ভয় দেখানো, ইত্যাদি সমস্তই হোলো।

পঞ্চার দিকে আঙুল দেখিয়ে পুলিশ সায়েব ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বললেন, "এই, আপনি এখানে এসো তো।—তুমি ব্যাটা চুরি করেছেন। ঘড়িটা দাও।"

লাল-পাগড়ি, রক্তমুখী গোরা, ডলির বাবার গম্ভীর হুমকি, খাকি পোষাক, তামাকের নেশা, পেটের মধ্যে ক্ষিধের জ্বালা—সবকিছু মিলিয়ে পঞ্চার কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো। বাবলিকে কোলে নিয়ে মেঝের দিকে চোখ রেখে সে ঘরে এসে দাঁড়ালো। পুলিশ সায়েব ম্যাজিস্ট্রেটের সেই 'ম্যারেজ ডাউরি'র 'জোক'টা জানেন। থমথমে আবহাওয়ার পর একটু রসিকতা করে, পঞ্চাকে নিয়ে মজা করে, চা বিস্কুট লুচি খেয়ে, সিগার টানতে-টানতে যখন তিনি বিদায় নিলেন তখন বিকেল হয়ে গেছে।

সন্ধের মুখেই থানা থেকে খবর এলো। কমলকে একবার

যেতে হবে, পারলে ডলিকেও। অনেকগুলো ফেরিওলাকে পুলিশে ধরেছে। তাদের মধ্যে যারা এসেছিলো কাপড় বিক্রি করতে—কমল কিংবা ডলি যেন তাদের সনাক্ত করে।

কমল একবার আবছা দেখেছিলো সেই ফেরিওলাদের। ডলির শরীর ভালো না, সে যেতে পারবে না। অতএব কমলই গেলো। ভিড়ের মধ্যে সেই কাপড়ওলাদের কমলের চিনতে দেরি হোলো না। ডলি তাদের খুঁটিনাটি যে-বর্ণনা দিয়েছিলো তার সঙ্গে কমলের আবছা স্মৃতি একেবারে মিলে গেছে।—সেই ভায়োলেট রঙের সার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া ফতুয়া-পরা মুটে, দাঁত উঁচু দলের সর্দার—না, তাদের চিনতে কমলের ভুল হয়নি।

দারোগা অন্যান্য ফেরিওলাদের ছেড়ে সেই চারজন কাপড়-ওলাকে আটকালো। "মিঃ ভৌমিক, আপনি যান। এদের আমি শায়েস্তা করছি। হাকিমবাড়িতে চুরির ফলটা এখনি পাবে এরা।—এই ব্যাটা, হারামজাদা, ঘড়িটা বার করবি নাকি রক্ত-গঙ্গা বওয়াবো? আমার নাম শুনেছিস?—জানিস?—ভালোয়-ভালোয় এখনো বার করে দে, নইলে—" অকস্মাৎ তিনি এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন সেই দাঁত-উঁচু দলের সর্দারের গালে।

লোকটা ঘুরে মাটিতে পড়লো। আতঙ্কে তার চোখ দুটো কক্ষচ্যুত হয়ে যেন ঠিকরে মাটিতে এসে পড়বে।

কমল থানার বাইরে এসে দাঁড়ালো। পিছন-পিছন একমুখ হেসে দাঁড়ালো দারোগা। "আপনি বাড়ি যান সার। আমাদের এইসব রাফ এণ্ড রেডি ট্রিটমেণ্ট আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না—ঘড়ি হজম-করা মুখের কথা নয়। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের জামাইয়ের ঘড়ি। ঠিক বার করে দেবো। —এই শুয়োরের বাচ্চা, হারামজাদা, রাস্কেল—"

ধীরে-ধীরে কমল বাড়ি ফিরলো। সমস্ত মনটা তার বিষিয়ে গেছে। ঘড়িতে তার আর প্রয়োজন নেই। রোলেক্স না পাক, কলকাতায় ওমেগা-টোমেগা কিছু একটা কিনে নিলেই চলবে।—কিন্তু তার জন্য এমন সব, "ইনহুম্যান ট্রিটমেণ্ট" !— এইজন্যই ডলি বোধ হয় তাকে 'এফিমিনেট' বলে।

কিন্তু বিস্ময়ের তার তখনো অনেক বাকি। বাড়ি ফিরে দেখে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ড্রয়িংরুমে ডলির বাবা, মা, ডলি নিজে এবং অন্যান্য সমস্ত ঝি-চাকর পঞ্চাকে ঘিরে রয়েছে। শরীরের মধ্যে তার কান দুটো অস্বাভাবিক বড়। ডলি মাঝে-মাঝে তাকে 'লম্বকর্ণ' বলে ডাকে। সবাইকার মাঝখানে পঞ্চা জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে। তার লম্বা কান দুটো আরো যেন লম্বা হয়ে গেছে। কোটরগত চোখ দুটোর তারা উজ্জ্বল বিজলি-বাতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে ভয় কিংবা আতঙ্ক—কী যে রয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"পঞ্চার কাণ্ড শুনেছো?" প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে ডলি তাকে প্রশ্ন করলো। "মা ঠিক ধরেছেন।—তুমি থানায় যাবার পর মা পঞ্চাকে ধরেছেন।—প্রথম থেকেই পঞ্চার ওপর তাঁর সন্দেহ। ওকে যতটা ভালোমানুষ মনে করো ততটা নয়। পাকা ঘুঘু একটা—বোকা সেজে থাকে।—প্রথম থেকেই ওর ওপর মার সন্দেহ। তুমি চলে যাবার পর জেরা করতেই সব বেরিয়ে পড়েছে।—কীরে—" সেই দারোগার মতো সজোরে এক চড় পঞ্চার গালে কষিয়ে ডলি তাকে প্রশ্ন করলো, "—ঘড়িটার কী করেছিস?—জামাইবাবুকে বল।"

সমস্ত দিন অনাহার, তামাকের অভাব আর মারধোরে পঞ্চা কেমন যেন হয়ে গেছে। শরীরটা যেন তার নিজের নয়। ডলির প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সে একটু সরে দাঁড়ালো মাত্র। যেন নির্জীব একটা চামড়ার পুতুলকে ডলি মেরেছে।—কোনো কথা সে বললো না। কয়েক পা সরে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্পূর্ণ মৌন হয়ে সে শুধু দাঁড়িয়ে রইলো আর বিস্মিত হয়ে কমল ভাবতে চেষ্টা করলো গত বছর পূজোর সময় স্থানীয় সিনিয়র ক্লাবে 'শকুন্তলা' অভিনয়ে প্রিয়ম্বদা সেজে ডলি যে-মৃণাল-ভূজ-বেষ্টনীতে শকুন্তলার গলা জড়িয়ে কেঁদে দর্শকদের চোখে জল এনে ফেলেছিলো সেই কোমল বাহুতে পঞ্চাকে চড় মারার এ-রকম শক্তি এলো কোথা থেকে?

ডলির মা পঞ্চার লম্বা একটা কান কষে ধরে প্রশ্ন

করলেন, "বল হারামজাদা, জামাইবাবুকে বল—ঘড়িটার কী করেছিস।"

এক আশ্চর্য উপায়ে পঞ্চা যেন তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে! তার শরীরের বেদনা-বোধ যেন অন্য কারুর, তার নয়। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সে আবৃত্তি করে চললো, "—টেবিলের ওপর ঘড়িটা ছিলো। আমি পরিষ্কার করতে গেনু। ঘড়িটা মেজেয় পড়ে ভেঙে গেলো। আমি সেটাকে নিয়ে হুই হুথা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েচি।"

এবার চড় বসালেন ডলির মা। বললেন, "ঠিক কোনখানটায় বল হারামজাদা! 'হুই হুথা'—কোথায়?—মরতে-মরতে কেন ফেলতে গেলি?—যত পাপের ভোগ হয়েছে আমার। জামাইয়ের ঘড়ি, আর ও হারামজাদা জঙ্গলে ফেলে এসেছেন! —বুড়ো খোকা। দূর করে দেবো বাড়ি থেকে। পথে-পথে ভিক্ষে করে খাবি, সবাই লাথি-ঝাঁটা মারবে, তারপর গাড়ি চাপা পড়ে মরবি।—আমার হয়েছে মরণ। আমি আবার দয়া করতে যাই। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষি।—"

"কোনদিন বাবলি কাঁদছে বলে তাকেও তো মেরে জঙ্গলে ফেলে দিতে পারে," বলতে-বলতে ডলি শিউরে উঠলো।

ডলির বাবা বললেন, "সম্ভব, খুবই সম্ভব। পাগল আর ম্যানিয়াকদের বোঝবার জো নেই। আমিই ও-রকম তিন-চারটে কেস-হিস্ট্রি জানি।"

তারপর ধীরে-ধীরে কমল সবাইকার সমবেত কথা থেকে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলো। ডলির মা'র গোড়া থেকেই বুড়ো পঞ্চার উপর সন্দেহ হচ্ছিলো। কোনো দোষ করলেই লোকটা মাটির দিকে চেয়ে থাকে, কাজে ভুল করে, কক্ষনো চোখের দিকে চায় না। সেদিন সেই চাইনিজ টি-সেটের শুগার-বোলটা ভেঙে যখন কয়লার ঘরের কয়লার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলো—সেদিনও এই রকমই হাবভাব তার ছিলো। আজ সকাল থেকে পঞ্চাকে নাকি ডেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো না। যদি বা পাওয়া গেলো মেঝের থেকে মুখ তুলে একবারও সে ডলির মা'র চোখের দিকে চায়নি। তখনই তাঁর কেমন যেন খটকা লেগেছিলো। তারপর কমল চলে যেতে তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। প্রথম কয়েকটা চড়-চাপড়ে সে উত্তর দেয়নি। প্রশ্নের উত্তর দিতে পঞ্চা কখনো জানে না। তাকে 'সাজেস্ট' করতে হয়। তিনি তাই পঞ্চাকে প্রথমে বললেন, "তুই তো জানিস ঘড়িটা কোথায় ?"

মাটির দিকে চেয়ে পঞ্চা নিরুত্তর রইলো।

তার লম্বা কান ধরে এক চড় কষিয়ে তিনি বললেন, "কী করেছিস ? চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিস ?"

তবুও পঞ্চা নিরুত্তর।

"নাকি ফেলে দিয়েছিস ?"

পঞ্চা একটু উসখুস করে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে যাকে 'ব্রেন ওয়েভ' বলে তাই এসেছিলো ডলির মা'র মাথায়। ঝাঁ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ঘড়িটা ভেঙে ফেলে ভয় হোলো, তাই ফেলে দিয়েছিস,—কেমন, তাই না? সত্যি কথা বল, তোকে কেউ মারধোর করবে না।"

মাটির দিকে চেয়ে পঞ্চা শুধু বললো, "হুঁ।"

"কখন ভাঙলি?—জামাইবাবু যখন খেতে গিয়েছিলো?"

"হুঁ।"

"ঘড়িটা কোথায় ছিলো? টেবিলের ওপর?"

"হুঁ।"

"ভেঙে তোর মনে হোলো সবাই এবার তোকে মারধোর করবে। তাই সে-ঘড়িটা আর ভাঙা কাঁচগুলো নিয়ে তুই ফেলে দিয়ে এলি?"

"হুঁ।"

"হুঁ তো বুঝলুম। বল হারামজাদা, কোনখানটায় ফেলেছিস।"

ঠিক এইখানে এসেই বরাবর আটকে যাচ্ছে পঞ্চা। একবারও সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। একবার বলছে কয়লা-ঘরে, একবার বলছে মেদিগাছের ঝোপে আর একবার বলছে নর্দমায়।

ডলির বাবা সমস্ত শুনে বললেন, "ঠিক আছে। কাল থরোলি সমস্ত বাড়ি কুম্ব করবো।—ও ঠিকই বলছে বলে মনে হয়। কোনো চোর হলে পেনটাও নিশ্চয় নিয়ে যেতো। ওটার ব্রেন

বলে কোনো পদার্থ নেই, ডেভেলাপই করেনি ব্রেনটা। আজ ভালো করে ওকে খাওয়াও, মারধোর বন্ধ করো। ঘুমুতে দাও, তামাক খাওয়াও—লেট হিম হ্যাভ সাম রেস্ট। কাল সকালে নিজেই খুঁজে বার করে দেবে।"

"খুঁজে বার করবে না হাতি।" ডলির মা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। "তোমার মতো ভালোমানুষ সাজলে যে-খবরটা বার করেছি সেটাও এখনো বেরুতো না। আজ ওর খাওয়া বন্ধ। সমস্ত দিন উপোষ দিয়ে আছে, সমস্ত রাতটাও থাকুক। পেটের জ্বালা ধরলে কাল সকালে নিজেই বার করে আনবে।"

অন্ধকার হয়ে গেছে। বর্ষার আগাছা আর বুনো লতা মেদি গাছের বেড়ার সঙ্গে ঘন হয়ে জোট পাকিয়ে রয়েছে। রাত্রে খোঁজা নিরর্থক। আগামীকাল ভোরেই ভালো করে খোঁজ হবে।

তারপর খাবার ঘরের টেবিলের চারপাশে সবাই জমা হোলো। সমস্ত দিন সবাইকারই দারুণ স্ট্রেন গেছে। সকাল-সকাল-খাওয়া দাওয়া সেরে কাল ভোর-ভোর উঠতে হবে।

সবে তখন মুর্গির রোস্ট টেবিলে পড়েছে এমন সময় সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলো। খাবার টেবিলে সেই চুরি-যাওয়া ঘড়িটার কথাই হচ্ছিলো এমন সময় বাবলি তার এক মাথা ঝুমকো চুল দুলিয়ে টলতে-টলতে ঘরে ঢুকলো। অন্য দিন এতোক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ এ-বাড়ির বিচিত্র হৈ-চৈ-তে তার ঘুম আসেনি।

"বাবুয়া, আমি ঘড়ি পরবো। আমাকে পরিয়ে দাও।" বলে সোজা কমলের কাছে সে ছুটে গেলো। তার হাতে সেই রোলেক্স ঘড়িটা।

"ওমা, কোথায় পেলি ?"

"বাই জোভ—".

"কে দিলোরে ?"

"এই কালি, বল ?"

"ওরে নিধি—"

"পঞ্চা পঞ্চা—"

সবাই একে-একে জড় হোলো, শুধু পঞ্চা কোথাও নেই। ডলি এবং তার মার চতুর প্রশ্নে টুকরো-টুকরো করে যে-ঘটনাগুলি বাবলির কাছে জানা গেলো তাদের জোড়াতালি দিলে এই দাঁড়ায় : বাবুয়া স্নান করতে যাবার পর বাবলি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে ঘড়িটা নেয়, তারপর নিজের খেলনার বাস্কেটে রেখে ভুলে যায়। রাত্রে কী তার খেয়াল হয়েছিলো ঈশ্বরই জানেন। সেই খেলনার বাস্কেট থেকে ঘড়িটা বার করে সে তার বাবার কাছে এনেছে। ঘড়িটা সে এখন পরবে।

"আহা, পঞ্চাটা মিছিমিছি কী মারটাই না খেলো।" ভিজে-ভিজে গলায় ডলি বললো।

"আমি বলেছিলুম এটা পঞ্চার কাণ্ড নয়, ফার ট্যু ক্লেভার

ফর হিম—” মুর্গির একটি ঠ্যাং চিবুতে-চিবুতে ডলির বাবা বললেন।

“ওকে সকাল থেকে কিছু খেতে দিইনি, ঠাকুর ভালো করে ওকে মুর্গি আর ভাত দাও আর নিধি, ওর জন্যে তামাক সেজে দিস।”

নিধি বললো, “তা তো দোবো মা, কিন্তু পাগলা বুড়োটা তো নেই, ভয়ে কোথায় পালিয়েছে।”

কিন্তু পঞ্চা সত্যিই তখনো পালায়নি। পালাবার উপক্রম করেছে মাত্র। সবাইকার খাওয়া শেষ হবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো। মেদি গাছের ঝোপের পাশে সে শুয়ে আছে, পাশে প্রচুর ধোঁয়া উড়িয়ে লণ্ঠনটা জ্বলছে।

ধরাধরি করে তাকে বাইরের বারান্দায় তুলে আনা হোলো। তার চোখ বুজে গেছে। তবু বিড়বিড় করে সে বলছে, “ঝোপের এইখানটায় ঘড়িটা ফেলনু, কোথায় গেলো!”

“ঘড়িটা পাওয়া গেছেরে—” ডলির মা তার কানের কাছে চীৎকার করে বললেন। পঞ্চার ঠোঁট দুটো সামান্য নড়লো। কিন্তু কোনো কথা শোনা গেলো না।

ততক্ষণে ডাক্তার পৌঁচেছেন। রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, “স্নেক বাইট। বোধ হয় কেউটে। এই মনসুনে এখানে বেজায় সাপের উৎপাৎ। কালকেই স্যার, বাড়িটার চারদিকে ভালো করে ডি. ডি. টি. স্প্রে করার বন্দোবস্ত করবেন।”

তিন নম্বর

ঠিক এক বছর পরে সারদা আবার সেই বুড়ো-বটগাছের তলায় বেঞ্চিতে বসলো। এক বছর আগে ঠিক যেমন ছিলো তেমনি আছে—কোনো পরিবর্তন হয়নি। না গাছের, না বেঞ্চির, না মানুষগুলোর।

ঘণ্টার সেই পরিচিত টিং-টিং যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। অনেক-অনেক দূর থেকে। ভিড়ে মাটি দেখা যায় না। হাজার-হাজার মানুষের পায়ের আঘাতে বাদামি রঙের ধুলো উড়ছে। মাত্র আর কয়েক মিনিট—এখনি ছোটো-ছোটো ঘুলঘুলিগুলো ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাবে। নোটের তাড়া বার করে স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক দৌড়চ্ছে। সামনের বুকির ছাউনি থেকে নানা জোট-পাকানো চীৎকার আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। ইহুদি, মাড়োয়াড়ি, চিনে, ফিরিঙ্গি, শিখ, কাবুলি—নানা বিচিত্র বয়স এবং বিচিত্র ঢঙের নারী-পুরুষের জগা-খিচুড়ি। প্রতি পলকে ঘোড়াগুলোর দর বদলাচ্ছে: "নম্বর এইট? ফোর টু ওয়ান, থ্রি টু ওয়ান—ফাইভ হান্‌ড্রেড?" খস-খস করে কার্ড লেখা হয়ে গেলো। "নম্বর এইট? থ্রি হান্‌ড্রেড? নম্বর এইট থ্রি টু ওয়ান, থ্রি টু ওয়ান নম্বর এইট—" নোটের তাড়া

দিয়ে বুকির কাছ থেকে নীল কার্ডটা নিয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট খর্বকায় পার্শি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলো।

সারদা দেখতে পার্চ্ছে না, কিন্তু খটাখট শব্দ কানে আসছে। বড় বোর্ডটায় ঘোড়ার নম্বরের তলায় ক্রমাগত সংখ্যা বদলাচ্ছে। একবার চাইলেই বোঝা যাবে প্রত্যেক ঘোড়ার উপর 'উইন' এবং 'প্লেসে' কত টিকিট বিক্রি হোলো। কে জানে তিন নম্বর ঘোড়ার উপর 'টোটে' কত টিকিট পড়েছে। কিন্তু 'টোটে'র খবরে তার কী দরকার? বুকির কাছে এইট-টু-ওয়ান দর সে পেয়েছে। টোটে তিন নম্বর 'ইভ্‌ন্ মানি' হলেও তার ক্ষতি নেই। সাত হাজারে এইট-টু-ওয়ান। সাত আষ্টে ছাপান্ন, মনেমনে গুণ করলো সারদা। ট্যাক্স-ট্যাক্স বাদ দিয়ে পঞ্চাশ হাজারের নীচে নামবে না। পঞ্চাশ হাজারেই সে খুসি, পঞ্চাশ হাজার হলেই চলবে। বাড়িটা ছাড়িয়ে নিয়েও বিশ হাজার হাতে থাকবে। সুজাতার গল-ব্লাডার অপারেশন, ছায়ার বিয়ের খরচ মিলে বিশ হাজার নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবে না। মাথা থেকে মস্ত বোঝা নামবে।

সমস্ত বাড়িটা জৈন-এর কাছ থেকে ছাড়িয়ে কী ভাবে তাঁকে শিক্ষা দেবে ভাবতে-ভাবতে তার মাথার মধ্যে যেন অসংখ্য ঘণ্টা টিং-টিং করে উঠলো। যেন নেসা ধরে গেলো সেই শব্দে।

পাম্পসুর উপর তার ধুতির কোঁচানো কালো পাড়টা ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। গিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবি আর

কোঁচানো কাঁচি ধুতি না হলে ফ্যামিলি প্রেস্টিজ থাকে না। মোটাসোটা পৌঢ়া ফিরিঙ্গি মেয়েটা যখন তার পাশে বসে হাঁপাতে লাগলো সরদার মাথায় তখন ঐ ফ্যামিলি প্রেস্টিজের কথাটাই উঠলো ঝিকঝিক করে। একটু সরে বসলো সারদা। তারপর মৃদু হেসে ভাবলো তার কোঁচানো ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি দেখে কে এখন অনুমান করতে পারবে তার সমস্ত সম্পত্তি বর্তমানে তিন নম্বর ঘোড়ার খুরে বাঁধা রয়েছে!

টিং-টিং শব্দটা যেন আরো দূরে সরে গেছে। বুড়ো বট-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সোজা-সোজা আলোর তীর পাঠিয়েছে শীতের সূর্য। সেই আলোয়-ভাসা তামাটে ধুলোর কণাগুলো যেন সহজেই গোণা যায়! তিন নম্বর উইনে আটের দর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাকা নিয়ে—হয়তো চেকই পাবে—সে ট্যাক্সি নিয়েছে।…জৈন-এর মুখে ত্রিশ হাজারি তোড়াটা সে কি ছুঁড়ে মারবে? ভাবি বৈবাহিককে এক বাণ্ডিল নোট দিয়ে দু-চারটে হুল-ওলা বাঁকা-বাঁকা কথা শোনাবে কি সারদা? সুজাতার যন্ত্রনা-ক্লিষ্ট মুখে কি হাসি ফুটবে ক্ষণকালের জন্যও? —"দেখো দিকিনি, কী অন্যায়! যদি তিন নম্বর না জিংতো! কোথায় দাঁড়াতে?" নিশ্চয়ই এ-ধরনের কথা বলবে সুজাতা। আজ উনিশ বছর ধরে সে কি সুজাতা-কে চেনেনি?

এই নভেম্বরেই তার চল্লিশ পূর্ণ হবে। একুশ বছরে বিয়ে, তারপর উনিশটা বছর। ইতিমধ্যেই টাক পড়েছে, নিটোল

গাল ভেঙেছে। কিন্তু আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি ঠিক উনিশ বছর আগেকার মতোই।

উনিশ লছর আগে প্রায় ছ'লক্ষ টাকার পৈতৃক সম্পত্তি আর ঘোড়ার নেশা উত্তরাধিকারসূত্রে সারদা পেয়েছিলো। সুজাতা তখন তেরো পারোয়নি। বেনারসি সাড়ির আর জড়োয়া গয়নার একটি নির্জিব ভীরু বোঁচকা ছাড়া সুজাতা আর কিছু ছিলো না। রাত্রি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা! মাঝরাতে জোর করে জাগালে তার সে কী কান্না! প্রথম-প্রথম ভারি বিরক্ত হোতো সারদা। তারপর ফতেমাবিবির খোঁজ পায়। বৃন্দাবন লোকটা তুখোড়, ফতেমা'র খোঁজ সে-ই এনেছিলো। প্রথমে সাদা ঘোড়ার জুড়ি হাঁকিয়ে, পরে নতুন মিনার্ভায় ফতেমা'র আড্ডায় সে যেতো। পাশে বৃন্দাবন, গোলাপি আতর তার উড়ুনিতে।...ফতেমা'র ঘরের আলোর কণা যেন হীরে থেকে ঠিকরনো, তার চোখের তারায় গাঢ় নীল রঙ; ডালিমের মতো ঠোঁট, রেশমি পেশোয়াজে ঘেরা, রেশমি ওড়নায় জড়ানো বিদ্যুল্লতার মতো তার দেহ...কাট-গ্লাসের ডিকাণ্টার—কতবার সোনালি পানিয়-ভরা সেই ডিকান্টার মেঝেয় আছড়ে সারদা চুরমার করেছে! ফতেমার বিদ্যুল্লতার মতো দেহের বঙ্কিম রেখা, পাকা ডালিমের ঠোঁট—সমস্ত মিলিয়ে বাকি রাতটাও সারদার না ঘুমিয়ে কাটতো। ভোরের দিগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমতো, ঘুম ভাঙতো মাঝ-দুপুরে। তখন চড়চড়ে রোদ।

সেই গোলাপি নেশা তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে! বিছানাটাও খালি। সুজাতা কখন উঠে গেছে কে জানে। চা সিগারেট পান খেতে-খেতে চড়চড়ে রৌদ্রের দুপুরগুলো সেই ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাসের কল্পনায় কেটে যেতো। আহা, কী সুন্দর দিনগুলো কেটেছে......

টিং-টিং শব্দটা হঠাৎ থেমে গেলো। কাউন্টারে-কাউণ্টারে কাঠের জানালাগুলোর কপাট ঠক-ঠক শব্দে বন্ধ হচ্ছে। সহস্র নরনারীর জনতার মোড় ফিরেছে। সবাই চলেছে উল্টো দিকে। ঘোড়াগুলো হয়তো এখন একে-একে বেরুচ্ছে। জকিদের কত রঙ-বেরঙের পোশাক কে জানে। কয়েকটা বুকি এখনো বাজির টাকা নিচ্ছে। সেই মোটা মাড়োয়াড়িটা হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চ্যাচাচ্ছে, "পাঁচ নম্বর থ্রি-টু-টু—তেত্রিশ হাজার।" যে-তিনজন বুকি তখনো বাজির টাকা ধরছিলো তাদের প্রত্যেকের কাছেই মাড়োয়াড়িটা তেত্রিশ হাজার করে থ্রি-টু-টু'র দরে শাউট করে গেলো।—খবর পেয়েছে নাকি লোকটা? কোনো জকির কাছ থেকে শেষ মুহূর্তের গুপ্ত খবর? তিন জায়গায় তেত্রিশ হাজার, অর্থাৎ নিরেনব্বই হাজার মোট! পাঁচ নম্বরে নিরেনব্বই হাজার?—সারদার মাথাটা বোঁ-বোঁ করে উঠলো। নিশ্চয়ই তার ভালো খবর আছে, শিওর-টিপস্। কিংবা কে জানে, সারদা আবার ভাববার চেষ্টা করলো, হয়তো এটা কিছু নয়; সম্ভবত কোনো গভীর ষড়যন্ত্র

আছে এর পিছনে। লোক-দেখানো নিরেনব্বই হাজার খেলে হয়তো কয়েক লক্ষ টাকা তিন নম্বরের উপরই সে ধরেছে।— কিন্তু তবু কী রকম যেন খুঁত-খুঁত করতে লাগলো তার মন। কাছে টাকা থাকলে পাঁচ নম্বরের উপর সে-ও নির্ঘাৎ কিছু ধরতো। কিন্তু সব টাকাটাই ইতিমধ্যে ধরা রয়েছে তিন নম্বরের উপর। যাকগে, মরুক—মনে-মনে বেপরোয়া হয়ে সারদা ভাবলো : মেড়ো ব্যাটা! কারুর চালেই সারদা ভুলবে না! ফতেমাবিবি আর ঘোড়ার পিছনে তার সব গেছে। ঝানু লোক সে। তাকে ধোঁকা দেওয়া সহজ নাকি ?

বটগাছের ভিতরকার রৌদ্রের তীরের দিকে চেয়ে আবার তার মন নতুন পথ ধরলো : কেন মানুষ চায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে? এইটাই কি এলিমেণ্ট্যাল ইন্সটিংক্ট? এলিমেণ্ট্যাল ইন্সটিংক্ট—কথাগুলা যেন চেনা-চেনা। কোন বই-এ যেন পড়েছিলো! কোন বই-এ? বই?—কতদিন কোনো বই-এর পাতা সে উল্টোয়নি? ছাপা হরফের সঙ্গে কতদিন কোনো সম্পর্ক নেই তার?—একদিন কত বই সে কিনতো! বই-এর পিছনেও কত টাকাই না সে ঢেলেছে! কলেজ জীবনে কী প্রিয়ই না ছিলো বইগুলো! নতুন বই-এর গন্ধেই যেন নেশা ধরতো!—তারপর ফতেমাবিবি, পিতৃবিয়োগ, বিয়ে, বৃন্দাবন, রেসের মাঠ।—আজ কতদিন হোলো কোনো বই-এর পাতা ওল্টায়নি? বইগুলোর কী হলো কে জানে!

একদিন ভেবেছিলো ভালো করে ইণ্ডেক্স করবে, গুছিয়ে রাখবে। এইবার নিশ্চয়ই নতুন আলমারি কিনে সুন্দর করে সাজিয়ে বই নিয়ে নতুন করে সে আবার সংসার পাতবে। শুধু তিন নম্বরের হারজিতে'র উপর সমস্তটাই এখন নির্ভর করছে!

...কিন্তু কী শয়তান বৃন্দাবনটা! আজ এতো বছর পরেও তাকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। সারদা বলেছিলো ফতেমার আলাদা বাড়ি করে দেবে, নেপালি দরোয়ান রাখবে। দিয়েওছিলো সে। নতুন ভাড়া-বাড়িতে ফতেমা উঠে গেলো, একশো টাকা মাইনের নেপালি দরোয়ান এলো, তার হাতে বন্দুক, কোমরে ভোজালি—কোনো রকম কার্পণ্য সারদা করেনি। কিন্তু কোনো খবর রাখতেই শয়তান বৃন্দাবনটার বাকি নেই। সে জেনেছিলো ভিতরে-ভিতরে সারদা ফাঁপা হয়ে এসেছে। সারদা'র চোখে ধুলো দিয়ে সামন্তকে ফতেমা'র বাসায় সে ভিড়িয়েছিলো।—কত বছর আগে আজ ঠিক মনে পড়েছে না, বোধ হয় ছায়া তখন দু বছরের—এই রেসের মাঠ থেকেই ত্রিশ হাজার হেরে বাড়ি না গিয়ে সারদা গিয়েছিলো ফতেমা'র বাসায়। তাকে দেখে নেপালি দারোয়ানটা কী রকম হকচকিয়ে গিয়েছিলো আজও স্পষ্ট মনে পড়ে!—হয়তো সামন্তকে খুনই করে ফেলতো, সামন্ত আর ফতেমা দুজনকেই—রিভলভারটা নেহাৎ তার কাছে ছিলো না।

তারপর কলকাতার বিশাল জনতায় বৃন্দাবন কোথায় ডুব

মারলো, সেই ডালিমের মতো ঠোঁট আর গোলাপি পেশোয়াজ-পরা ফতেমা'ই বা কোথায় উবে গেলো সারদা তার হদিস পায়নি। হার্টের অসুখে সামন্ত অল্প দিনের মধ্যেই মরেছিলো। শুধু সামন্ত'র ঠিকানাটাই সে জানে!

বুকিদের চীৎকার থেমেছে! টিং-টিং শব্দ নেই, খট-খট শব্দ নেই। হাজার নরনারীর রুদ্ধশ্বাস জনতা ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়েছে। দৌড় দেখতে গেছে সবাই। বুড়ো বটগাছের বেঞ্চি থেকে সারদা কিন্তু নড়েনি। সারদা কখনো দৌড় দেখে না। তার বুকের ভিতরে কী-রকম যেন কষ্ট হয়।

ঢং······ঐ শব্দ হোলো। ঘোড়াগুলো নিশ্চয়ই ছুটতে শুরু করেছে। দেড় মাইলের দৌড়। তার পাশের প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী ফিরিঙ্গি মেয়েটা খবরের কাগজ নাড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে, যদিও গরম এখন নেই। নিজের কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম দানা বাঁধছে। সারদার বুকের কাজ দ্রুততর হয়েছে, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন সিরসির করছে।—ক' মিনিট, আর ক'টি মুহূর্ত···

তারপর আবার মনের মোড় ঘুরলো।···বিরাট হাঙরের মতো জৈন-এর ক্ষুধার কথা মনে পড়লো। তার সমস্ত সম্পত্তি একে-একে সেই অতিকায় গহ্বরে অদৃশ্য হতে লাগলো। ফতেমা'র পর আরো কত বাঁকা হাসি, কাট-গ্লাসের ডিকাণ্টার, ফরাসি পানীয়। আরো কত নতুন ঘোড়া, ইয়ার বন্ধু, ঘুঁদে দালাল।···বুড়ি পিসি মরলো, ছায়া জন্মালো। সুজাতা

রীতিমতো গৃহিণী হয়ে উঠলো! এগারোটা বাড়ির মধ্যে একে-একে প্রায় সবগুলোই বাঁধা পড়েছে। শেষে একটায় এসে ঠেকেছে! জৈন-ও আর ধার দিতে চায় না। তারপর সুজাতা'র শরীর ভাঙতে আরম্ভ হোলো। সে শয্যাশায়ী হোলো। সার্জেন বললো গল্-ব্লাডারে পাথর জমেছে। হার্ট খারাপ, মেদ প্রচুর, তাই অস্ত্রোপচারে প্রচুর ভয়। একটু না সারলে অস্ত্রোপচার সম্ভব নয়। এমন সময়, এক বছর আগে, সারদা প্রতিজ্ঞা করে বসলো—রেসের মাঠে আর নয়। অসুস্থ সুজাতা ক্রমাগত কাঁদে। বলে, আর সে বাঁচবে না। মেয়েটা বড় হয়েছে, যেমন করে হোক তার একটা ভালো বিয়ে দেওয়া দরকার। সুজাতা বলে তার নিজের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। বলে, টাকা বাঁচাও, মেয়েটা একটা ভালো ঘরে পড়লে তৃপ্তি করে সে মরতে পারবে।

শেষ বাড়িটাও এক বছর আগে জৈন-এর কাছে প্রথমে পনেরো হাজারে বাঁধা দিতে হোলো। খুচরো দেনা মিটিয়ে মাস ছয়েক সংসার এবং চিকিৎসা চললো। অসুখ হলে সহরের সেরা সায়েব ডাক্তারকে দু'বেলা বাড়িতে ডাকা তাদের পরিবারের বনেদি নিয়ম। কোনো ত্রুটি হতে দেবে না চিকিৎসার—কঠিন পণ করলো সারদা। রেস ছাড়লো, মদ ছাড়লো। আর আবিষ্কার করলো বাইরের মেয়েতে তার চোখে আর ঘোর লাগে না। তারপরে, এক বছর আগে, চমকে সারদা দেখলো

ইতিমধ্যে সে রীতিমতো প্রৌঢ় হয়ে পড়েছে। তার উজ্জ্বল রঙ গেছে জ্বলে, তার সুন্দর চুলগুলো প্রায় এসেছে উঠে। তার শরীরের ভিতর কোন এক অতি-প্রয়োজনীয় একটা যন্ত্র যেন হারিয়ে গেছে। সেই শক্তি কোথায়? সেই ফুর্তি কোথায়? কোথায় দক্ষিণে বাতাসের ঘোর-লাগা রাতগুলো?

মাস ছয়েক পরে জৈন-এর কাছে আবার টাকা ধার করতে যেতে হোলো। বাড়িটার দাম সত্তর হাজারের কম নয়। মাত্র পনেরো হাজার দিয়েছিলো, ছ'মাস পরে অনেক আপত্তি তুলে আরো আট হাজার জৈন ধার দিলো। সুদের হার এবার অনেক চড়া এবং বে-আইনি চড়া সুদের এক বছরের টাকাটা এই আট হাজার দেবার সময় প্রথমেই কেটে নিতে সে ভুললো না।

সে-টাকাও ফুরলো। এদিকে সুজাতার অপারেশানের আর দেরি চলে না। সুজাতার শরীর এর চেয়ে সুস্থ আর কোনো দিনই হবে না। সায়েব সার্জেন তাই এই অবস্থাতেই অপারেশান করতে রাজি হয়েছেন।—মিত্তির বাড়ির বৌরা কোনো দিন হাসপাতালে যায়নি। সুজাতাকেও তাই সে হাসপাতালে পাঠাবে না। বাড়িতেই হবে। সায়েব সার্জেন, মেম নার্স এবং অন্যান্য সব খরচ মিলিয়ে সারদা হিসেব করে দেখেছে পাঁচ-ছ' হাজারের কমে হবে না। আবার জৈন-এর দারস্থ হতে হোলো। লোকটা ভদ্রতার মুখোস বাহুল্যজ্ঞানে এবারে

একেবারে ছেড়েছে। তার খাঁই-ও বেড়েছে আরো। মাথা ঠাণ্ডা করে মাত্র সাত হাজার নিয়ে সারদা যে কী করে বেরিয়ে এলো সে-কথাটা এখন ভাবতে গেলে তার নিজেরই অবাক লাগে।

টাকাকে তার বিশ্বাস নেই। অন্যান্য বারের মতো আজকেও টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু জৈন-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই পরিচিত হাঁক শুনে থমকে দাঁড়াতে হোলো। সেই বুড়ো লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আর হাঁকছে : "রেস বুক। রেস বুক। রেস বুক।"

এক বছর পরে আজ আবার তার বুকে রক্তের ঢেউ এসে ধাক্কা মারলো আর সঙ্গে-সঙ্গেই ভোরবেলাকার স্বপ্নটা আবার মনে পড়লো : সবুজ মাঠ, শাদা কাঠের খুঁটি, উত্তেজিত জনতার চীৎকার আর ফিনিসিং পোস্টের কাছে শাদা ঘোড়ার পিঠে গাঢ় নীল রঙের জার্সি-পরা জকি। তিন নম্বর, তিন নম্বরের ঘোড়া জিতেছে! সারদার হাতে তিন নম্বর ঘোড়ার টিকিট! ভোরবেলার স্বপ্ন, ভোরের স্বপ্ন কি কখনো মিথ্যে হয়?

ট্যাক্সিতে উঠে বিস্মিত হয়ে সারদা ভাবতে লাগলো, কী আশ্চার্য, আজ শনিবার সে-কথা মনেই তার ছিলো না। যতগুলো রেসে তিন নম্বরের ঘোড়া ছুটছে রেসের বই হাতড়ে তাদের সে বার করলো। অধিকাংশ ঘোড়াই তার চেনা, শুধু তিন নম্বর ঘোড়াটার নাম আগে সে শোনেনি।—তিন নম্বর রেস,

তিন নম্বর ঘোড়া, ভোরবেলার স্বপ্ন—তার জুয়াড়ি মন এক নিমেষে থরথর করে উঠলো। তার ভাগ্য-দেবতা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন—

এক বছর পরে রেসের মাঠে ঢুকতে-ঢুকতে সুজাতার যন্ত্রণা-কাতর মুখটা সারদার অস্পষ্ট একবার মনে পড়লো, মনে পড়লো ছায়া হয়তো ভাতের থালা আগলে তার জন্য অপেক্ষা করছে—কিন্তু কতই বা দেরি হবে? তিন নম্বর রেসের পর জিতের টাকা কালেক্ট করে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে বড় জোর সাড়ে তিনটে।

প্রথমে ঠিক করেছিলো খুব সাবধানে খেলবে, কয়েকশো টাকার বেশি কখনই বাজি ধরবে না। কিন্তু বুকির সামনে দাঁড়িয়ে একশো, না হাজার, না তিন হাজার—কী বলবে সে ঠিক করতে পারলো না!—তিন নম্বর এইট টু ওয়ান। সাত হাজার, এইট-টু-ওয়ান— ছাপান্ন হাজার—ছাপান্ন হাজার—। তার মাথার মাঝখানটায় যেন ভীমরুলের চাক ভেঙে গেলো।—বুকি তার হাতে যখন নীল পেন্সিলে-লেখা কার্ডটা দিলো সারদা দেখলো পুরো সাত হাজার টাকাই সে খেলেছে! বুক পকেট থেকে একশো' টাকার নোটের তাড়াটা কখন সে বার করলো?

…সামনে উত্তেজিত জনতার চীৎকার শোনা যাচ্ছে। কত নম্বর? ঐ হল্লার ভিতর তিন নম্বরকে চিনে বার করা

শক্ত। দাঁতে-দাঁত ঘসে সরদা মাটির দিকে চেয়ে আছে। গুরগুর শব্দ ক্রমশ একটা বিরাট ঢেউ হয়ে ওপাশে ভাঙলো যেন। বুকিরা রেস দেখে বায়নাকুলার নিয়ে নিজেদের জায়গায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। দেখতে-দেখতে তার সামনের জায়গাটা আবার বিচিত্র কলরবে পূর্ণ হোলো, ভিড়ে আবার অদৃশ্য হয়েছে মাটি। হাজার মানুষের পায়ের আঘাতে বাদামি রঙের ধুলো উড়ছে। সামনের ভদ্রলোকের জামায় টান দিয়ে সারদা প্রশ্ন করলো, "হ্যাঁ মশাই, কত নম্বর ?"

"আট নম্বর—"

"তিন নম্বর ?"

"আট নম্বর।"

উঠে দাঁড়িয়ে সারদা আবার বললো, "তিন নম্বর ?"

বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "না-না মশাই আট নম্বর, আ-ট-ন-ম্ব-র—"

"তিন নম্বর জিতেছে ? হাঃ-হাঃ। ভোরবেলার স্বপ্ন মশাই। সাত আস্টে ছাপান্ন। নেট পঞ্চাশ হাজার।—হাঃ-হাঃ, তিন নম্বর জিতেছে—" বলতে-বলতে সারদা আবার সেই বুড়ো বটগাছের তলার বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়লো।

মর্মর

এইবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে উঠে মনেমনে বললুম : আর না, এই শেষ ! একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার তিনবার ! চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আর যেখানে যাই—করাচি কি লামডিং, কানপুর কি কোহিমা—দিল্লিতে আর নয় ! আগের দুবার ইন্টারভিউ দিতে আসতে হয়েছিলো দারুণ গ্রীষ্মে। লাভের মধ্যে শুধু হয়েছিলো শরীর আধখানা আর পকেট খালি। কিন্তু চাকরি হয়নি। এবারেও তাই। তবে একমাত্র ভালো যা দেখছি এবার আসতে হয়েছে শীতে। তাই অন্যান্যবারের মতো এবার আর শুধু দিল্লিতে ওঠা আর হাওড়ায় নামা নয়। ঠিক করেছি অন্তত আগ্রা হয়ে তাজমহল দেখে ফিরবো।

কিন্তু কে তখন জানতো এবার আমার কপালে তাজমহল দেখা নেই !

যখন ট্রেনে উঠলুম কামরা বেশ খালি ছিলো। কিন্তু আজকাল তো খালি থাকার উপায় নেই। দেখতে-দেখতে ভরে উঠলো : বেঁটে লম্বা, রোগা মোটা, ইহুদি বার্মিজ, মুসলমান হিন্দু, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, ছেলে মেয়ে—একেবারে মানুষের খিচুড়ি।

এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছি এমন সময় একটি পাঞ্জাবি মুসলমান আমারি কামরাতে উঠলো। পরনে গরম ট্রাউজার আর কালো শেরোয়ানি, মাথায় লাল ফেজ। টকটকে রঙ, উন্নত কপাল, টিকলো নাক আর দুজোড়া গভীর কালো বাঁকানো ভুরুর নীচে নীল চোখ। তার সমস্ত চেহারায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, প্রতিভার স্বাক্ষর। অথচ সমস্ত ভঙ্গীতে একটি বিষণ্ণ মাধুর্য। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম তার কারণ সেই আশ্চর্য দুটি চোখ। সে-চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, অথচ তীক্ষ্ণ নয়। বিষণ্ণ অথচ মধুর। সে যেন এই কামরার অদ্ভুত জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজের চারিদিকে একটি নির্জনতার পাঁচিল তুলে দিয়েছে। আমার পাশে দাঁড়িয়েও সে যেন রয়েছে অনেক-অনেক দূরে। ভিড় দেখে সমস্ত মেজাজ যে-রকম বিগড়ে গিয়েছিলো তাকে দেখেই কিন্তু আবার হালকা হয়ে এলো। নিজেকে আরো অনেকটা সঙ্কুচিত করে আমার পাশ থেকে দুটো বই সরিয়ে কোনো রকমে আর একটি মানুষের মতো জায়গা করে হেসে তাকে ইংরিজিতে বললুম বসতে। সে-ও হাসলো তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে দুটি বেঞ্চির মাঝখানে-রাখা আমার হোল্ড অলের উপর বসে ইংরিজিতে বললো, "এইখানে বসলে আমরা দুজনেই আরামে যেতে পারবো।—কিন্তু আপনি কি বাঙালী ?"

বললুম, "হ্যাঁ, কিন্তু কী করে জানলেন ?"

ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় বললো, “বাঙালীকে বাঙালী বলে চিনে ফেলা খুব এমন কঠিন নয়। বিশেষ করে আমার পক্ষে, যে ছ বছর কলকাতায় ছিলো!”

দেখতে-দেখতে আলাপ হয়ে গেলো। ছেলেটির নাম মির্জা। কলকাতার আর্ট-স্কুলের ছাত্র ছিলো। সেখান থেকে পাশ করে গিয়েছিলো ফরাসি দেশে মূর্তি-গড়া শিখতে। আমাদের গল্প জমে উঠলো। পাঁচমিশেলি লোকের ভিড়ে আমরা যে ট্রেনের কামরায় বশে আছি সে-কথা আমি তো স্রেফ ভুলেই গেলুম। তার মধ্যে কী যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অপরিচিতকে আত্মীয় করে নেবার দুর্লভ মন্ত্র।

“আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে এর আগেও দিল্লি এসেছিলেন।”

“হ্যাঁ, এইবার নিয়ে তিনবার। আশাকরি এইবারই শেষবার।”

মিষ্টি হেসে সে বললো, “ইন্টারভিউ দিতে বুঝি?”

বিস্মিত হয়ে বললুম, “কী করে জানলেন?”

আবার হেসে সে উত্তর দিলো, “এ আর এমন শক্ত কথা কী? দিল্লিতে আজকাল কি কেউ সখ করে বেড়াতে আসে? হয় ব্যবসা নয় চাকরি। আর যে-হেতু আপনি বাঙালী সে-হেতু অনুমান করা শক্ত নয় এসেছিলেন চাকরিরই খোঁজে। আপনার কথা শুনে বুঝলুম চাকরিটা হোলো না। কেমন—নয়?”

খুব সহজ করেই কথাগুলো সে বললো। আমারো মনে হোলো বাস্তবিকই কত সহজ আমার কথা জানা। তবুও কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো। মির্জার সেই গভীর নীল চোখের দৃষ্টি যেন আমার মনকেও স্পর্শ করেছে! আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করে সে বলে চললো, "কিন্তু বন্ধু। কখনো হতাশ হোয়ো না—তুমি বলে কথা বললে অসন্তুষ্ট হবে না তো? তুমি বলতেই ভালো লাগে। 'আপ্' কিম্বা 'আপনি'টা যেন বড্ড দূরে রাখে মানুষকে।—হ্যাঁ, যা বলছিলুম।—আমার তো মনে হয় মানুষের ভাগ্য হচ্ছে পাগলা ঘোড়ার মতো! কেবলি লাফায়, পিঠে বসতে দেয় না। তাই বলে তুমি যদি হাল ছেড়ে বসে থাকো তা হলে তো হার হোলো তোমারই! কখনো হতাশ হোয়ো না। সেই পাগলা ঘোড়ার পিঠে জোর করে চেপে বস, প্রমাণ করো তুমি তার প্রভু, সে তোমার নয়। হয়তো প্রথমে দু-চারবার সে লাফাবে, পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি তুমি ঠিকমতো লাগাম কষতে পারো, ছপটি লাগাতে পারো তার বেয়াদপির পিঠে—দেখবে, সে তোমার বশ হয়ে এসেছে। দেখবে সেই ঘোড়াই নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে। একটির পর একটি রাজ্য জয় করে তোমাকে সে দিগ্বিজয়ী করে তুলবে।—চাকরি হোলো না তো কী হয়েছে? অন্য পথ দেখো! ব্যবসা করো। প্রত্যেক মানুষের উপযুক্ত পথ তো সংসারে আছেই। শুধু খুঁজে নিতে

হয়।" এক নিশ্বেসে এতগুলো কথা বলে সে বুঝি একটু লজ্জিত হোলো। তারপর হেসে বললো, "উপদেশ দিলুম বলে রাগ করলে না তো? তোমাকে ভালো লাগলো বলেই বললুম। এ আমার মনের কথা। তা ছাড়া," এবারে একটু রহস্যজনক হেসে বললো, "তা ছাড়া তোমার কপালেও লেখা রয়েছে ব্যবসাতেই হবে তোমার উন্নতি।"

আমি বললুম, "সত্যি না কি? আর কী লেখা রয়েছে বলতে পারো?"

"বলবো?" আবার সে হাসলো, "তুমি টুণ্ডলায় নামবে, আর যাবে আগ্রায় তাজমহল দেখতে। কিন্তু এ-যাত্রায় দেখা হবে না।"

"কেন?"

খুব একটা গম্ভীর গণক-গণক মুখ করে সে বললো, "তুমি যে-রাতে জন্মেছিলে সে-রাতে চাঁদ উঠেছিলো বারোটায়। আজকেও তাই উঠবে। শাস্ত্রমতে সে-কারনেই তোমার কপালে আজ রাতে তাজমহল দেখা নেই। যে-রকম হাওয়া বইছে আর আকাশটা যে রকম মেঘে ছেয়ে রয়েছে তাতে বৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। এই ডিসেম্বরের শীতে বৃষ্টি মাথায় করে তুমি কি রাত বারোটার চাঁদের আলোয় আজমহল দেখতে পাবে বলে আশা কর?"

হো-হো করে হেসে বললুম, "গণক ঠাকুর! তোমার গণনা

কিন্তু এবার ভুল হোলো। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন খটখটে রোদ, রাত নয়।—কিন্তু সে-কথা যাক! আমি যে আগ্রায় যাচ্ছি সে-কথা কে বললে?"

"কে আবার? কেউ না। সোজা কলকাতায় যাবার মতলব থাকলে তুমি তো বিছানাটা খুলে অন্তত পিঠে একটা বালিস লাগিয়ে বসতে!"

"কিন্তু আগ্রাতেই যে যাবো সে-কথাই বা বললে কে?"

"অন্য কোথাও গেলে অন্য ট্রেনে উঠতে, দিনের গাড়িতে। তা ছাড়া বাঙালিবাবুরা তাজমহল দেখতে বড় ভালোবাসে! কিন্তু তুমি এর আগে যে আগ্রায় আসোনি সে-কথাও আমি বলতে পারি।"

যদিও নিতান্তই রহস্যচ্ছলে কথাবার্তা চলছিলো তবুও এমন একটি অস্বস্তি বোধ করছিলুম যা ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না। তাই শুধু প্রশ্ন করলুম, "বল, কী করে জানলে।"

আবার সে হো হো করে হেসে বললো, "যারা আগে একবারও আগ্রা গেছে তারা জানে সকালের ট্রেনে যাওয়াই সবদিক দিয়ে সুবিধের। কোনো বদল নেই।" তারপর একটু থেমে বললো, "আমার বাড়িও আগ্রায়। সকালের ট্রেন মিস্ করেছি বলেই এ-গাড়িতে উঠতে হোলো। দেখছি লোকসান হয়নি! তোমার মতো একটি বন্ধু আজ পেলুম এবং সে-বন্ধুটিকে আমার গরিবখানায় নিয়ে গিয়ে ধন্য হবো।—

আমাদের বাড়িতেই তোমাকে ভাই থাকতে হবে কিন্তু। কোনো আপত্তি শুনবো না!"

"এ তো বড় মজার ব্যাপার হোলো!" ঠিক কী বলবো ভেবে না পেয়ে বললুম।

মির্জা আবার হাসতে লাগলো। বললো, "পৃথিবীটাই মজার! কত মজার ঘটনা ঘটে, দেখবে!—ভালো কথা, তোমাকে এমন একটি জিনিস দেখাবো আগ্রার তাজমহলের চেয়ে যা কম আশ্চর্য নয়!"

"মানে?"

"এখন বলবো না। তবে এ-টুকু বলতে পারি তাজমহলকে হয়তো কোনোদিন ভুলবে কিন্তু তাকে ভুলবে না কোনোদিন!"

মির্জা চুপ করলো। ট্রেনে দারুন শব্দ হচ্ছিলো। কথাবার্তা ভীষণ চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছিলো বলে ক্লান্ত হয়ে আমিও চুপ করলুম।

টুণ্ডলায় গাড়ি বদল করে যখন অন্য ট্রেনে উঠলুম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধের দিকে চলেছে। সমস্ত আকাশ ধূসর কম্বলে ঢাকা। মাঝেমাঝে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। ইস্টিশানের ওপাশে বড়বড় নিমগাছগুলো ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাঁকড়াচুল পাগলের মতো মাথা নাড়ছে। হাতের তালু আসছে ঠাণ্ডা হয়ে, সমস্ত শরীর সির-সির করছে। সেই সিরসিরেনি যে শুধু ঠাণ্ডার জন্য নয় তখন সে-কথা বুঝিনি।

ট্রেন বদল করে কপালজোরে বসতে পেলেও দেখলুম এ-গাড়িতেও রীতিমতো ভিড়। মির্জা আমার পাশে বসে বললো, "যাক, তবু বসতে পাওয়া গেলো! গাড়ি লেট যাচ্ছে। আগ্রায় পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত ন'টা। হয়তো তখন বৃষ্টি জোরেই পড়বে। আমার টেলিগ্রামটা সময়মতো পেলে হয়! বাড়ির গাড়ি না এলে বিপদে পড়বো—অনেকটা পথ।"

"বাড়িতে কে-কে আছেন?"

একটু চমকে মির্জা বললো, "কে-কে?—কেন, আমার দাদামশাই আর স্ত্রী। আর কে থাকবে?"

বললুম, "না। সে-কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম।"

"আমার দাদামশাইকে দেখলেই বুঝবে কত সুন্দর তিনি। ফরাসি দেশ থেকে ফিরে ভেবেছিলুম তাঁর একটি পাথরের মূর্তি খোদাই করবো। কিন্তু, তারপর আমার বিয়ে হোলো আর তারপর সব যেন গোলমাল হয়ে গেলো। মূর্তিটি আর তৈরি করা হয়নি অনেক দিন। কত রাতে স্বপ্ন দেখেছি বুঝি শেষ হয়েছে সেই মূর্তি গড়া। জানতুম ঠিক আমার মনের মতন একটি মূর্তি গড়তে পারলে চারদিকে হৈ-হৈ পড়বে।··· অনেক দিন কেবল সেই মূর্তির কথাই ভেবেছি! শাদা পাথরে খোদাই একটি শুভ্র, শান্ত, মূর্তি। আমার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। তোমাকে আজ দেখাবো?"

আমি শুধু বললুম "ও।" কারণ এ-সব ব্যাপারে আমার

উৎসাহ বিশেষ নেই। সত্যি কথা বলতে কি এ-সব মূর্তি-টুর্তি আমি ভালো বুঝি না। বরাবরই দেখেছি এগজিবিশনে আমার যে-সব ছবি ভালো লাগে সমঝদার লোকেরা সেগুলোকে যাচ্ছেতাই বলে, আর সমঝদারদের কাছে যে-সব ছবি উচ্চ প্রশংসা পায় সেগুলো আমার লাগে যাচ্ছেতাই। তা ছাড়া, ট্রেনে উঠে পর্যন্ত আমার শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছিলো না। মাথার ভিতরে কেমন একটা টিপটিপে যন্ত্রণা বোধ করছিলুম। আর এমন একটা শীত-শীত লাগছিলো যেটা ঠিক ঠাণ্ডার জন্য নয়। আমার দিকে তার নীল চোখ তুলে কী যেন দেখে মির্জাও চুপচাপ জানালার বাইরে চেয়ে রইলো। ট্রেন যত এগিয়ে চললো আকাশ ততই হয়ে আসতে লাগলো কালো। টিপিটিপি থেকে বৃষ্টি নামলো জোরে। শীতের ছোট্ট বেলা যেন এক চুমুকে শেষ করে দিলো দীর্ঘ কালো রাত। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগলো। ঘাড়ের কাছে ওভারকোটটা পুঁটলি পাকিয়ে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগলুম।

কতক্ষণ ঢুলেছিলুম কিংবা ঘুমিয়েছিলুম জানা নেই। চোখ মেলে দেখি মির্জা আমার কপালে হাত দিয়ে ঠেলছে। মির্জার হাতটা যেন বড্ড বেশি ঠাণ্ডা। সে বললো, "এ কী প্রতুল! তোমার গা যেন গরম-গরম ঠেকছে!"

আমি বললুম, "না-না। ঠিক আছে। কিন্তু কামরার আর লোকেরা কোথায়? গাড়ি থেমে রয়েছে কেন?"

হেসে সে বললো; "আর সবাই তো নেমে গেছে। আমরা আগ্রায় পৌঁচেছি। চলো, নামা যাক।"

ওভারকোটে ভালো করে বোতাম এঁটে মাথায় টুপি দিয়ে মির্জার সঙ্গে নেমে এলুম। বৃষ্টি কিছু কমেছে। কিন্তু বাতাসে যেন শান দেওয়া। আর আকাশেও মেঘের কমতি নেই। ঘুমিয়ে উপকারই হয়েছিলো। মাথার যন্ত্রণা প্রায় নেই বললেই হয়। শরীরটাও বেশ হালকা-হালকা বোধ হোলো। একটু যেন বেশি রকম হালকা!

ইস্টিশান ছেড়ে আমরা বাইরে এলুম। বেশ রাত হয়েছে। একটিও টাঙা কিংবা ট্যাক্সি নেই। শুধু একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত তার গড়ন। পুরনো আমলের জুড়িগাড়ির মতো। এ-দেশে এ-ধরনের গাড়ি এই প্রথম দেখলুম। কাছে পৌঁছে দেখি গাড়ির ঘোড়া দুটো চমৎকার। আবছা আলো-অন্ধকারে তাদের দুধে-ধোয়া শাদা রঙ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাঝেমাঝে তারা পাথরে পা ঠুকছে আর ছোটোছোটো স্ফুলিঙ্গ—সোনালি আর নীল আর সবুজ—কয়েক মুহূর্তের জন্য উঠছে চমকে। একজন সহিস আমাদের সেলাম করে দরজা খুলে দাঁড়ালো। তার গায়ে দামী জরির পোশাক। গাড়ির ভিতরটিও চমৎকার। অনেকটা জায়গা। তুল-তুলে নরম গদি। এক ফোঁটা ধূলো নেই। নানা ধরনের নানা রঙের রেশমের তাকিয়া। ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বড় জোর ফুল-

দানি দেখা যায়। কিন্তু আতরদানি দেখে সত্যিই আশ্চর্য হলুম খুব। বুঝলুম আমার এই নতুন বন্ধুটি নিশ্চয়ই কোনো নবাব বংশের ছেলে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটলো। নিস্তব্ধ রাত্রিতে শুধু ঘোড়ার খুরের খুটখুট ছাড়া কোনো শব্দ নেই। ইতিপূর্বে এখানে কখনো আসিনি। নিস্তব্ধ এক শীতের ঝোড়ো রাতে দুধের মতো ঘোড়ায় টানা চমৎকার জুড়ি গাড়ির মধ্যে বসে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অবাস্তব, কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো! ভাবলুম মির্জার সঙ্গে একটু গল্প করি। কিন্তু এবার ঢোলবার পালা তার। জানালার পাশে মাথা রেখে সে ঢুলছে। গাড়ির মধ্যেকার একটি ছোট্ট ঝাড় লণ্ঠনের আলো তার মোমের মতো নরম মুখের একপাশে পড়েছে। তাকে আরো সুন্দর, আরো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। আমিও তার উদাহরণ অনুসরণ করলুম। ঢুলতে লাগলুম।

এবারেও কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। জেগে উঠে দেখি জুড়িগাড়ি থেমেছে আর মির্জা ডাকছে। শরীরটা আরো হালকা, মাথার ভিতরটা আরো যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো। সহিস দরজা খুলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নামলুম। কিন্তু এ এলুম কোথায়? তখন মাঝ রাত। একটি নিস্তব্ধ প্রাসাদের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে! অন্ধকারে দূরের গাছগুলো দুলছে আর বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস রাতকে যেন

করাত দিয়ে চিরছে। হু-হু করে উড়ে যাচ্ছে মেঘের পর মেঘ। আর শাদা ঘোড়া দুটো উত্তেজিত হয়ে মাঝে-মাঝে পাথরে পা ঠুকছে আর ঠিকরে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ—সোনালি আর নীল আর সবুজ। শ্বেত পাথরের প্রাসাদে মির্জার পিছন পিছন চললুম। সে যেন আরো গম্ভীর আরো অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হোলো না। সমস্ত শরীর অস্বাভাবিক হালকা লাগছে। মহলের পর মহল পেরিয়ে চললুম। সামনে মশালের আলো দেখিয়ে চলেছে জরির উর্দিপরা চাকর। আমাদের চলন্ত ছায়া মাঝে-মাঝে পাথরের উপর বড়-বড় হয়ে কাঁপছে। চুপচাপ শুধু এগিয়ে চললুম, জানি না কতক্ষণ। শেষে মহলের পর মহল পার হয়ে নানা ঘোরানো-পাকানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দরজার পাশে মশাল হাতে মাথা নীচু করে চাকরটা দাঁড়িয়ে রইলো। মির্জা দরজা খুলে আমাকে ইঙ্গিতে বললো আসতে।

ঘরের মধ্যে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। বিরাট সেই হলঘর। মেঝেতে পুরু দামি গালচে, ছাত থেকে ঝোলানো অসংখ্য ঝাড়-লণ্ঠন আর তাদের শাদা আলো জোৎস্নার মতো সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কোণে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ, সামনে স্ফটিক পাত্রে রঙীন পানীয়। পরনে শাদা মসলিনের চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি। মাথার

শাদা চুল পিঠে নেমেছে, শাদা দাড়ি নেমেছে বুকে। টকটকে তার রঙ। ফরসা নয়, ঈষৎ লালচে। দুটি চোখ নীলার মতো। পাশেই আতরদানি। একটি সোনার থালায় স্তূপ করা মোহর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝক করছে। সেই বৃদ্ধের কিছু দূরে আর এক বৃদ্ধ বাজাচ্ছে সেতার—আর কিছু দূরে নৃত্যরত এক নর্তকী। তার রেশমের ওড়না উঠছে ফুলে-ফুলে, তার ঠোঁট ডালিমের মতো রাঙা, তার রঙ পুরোনো হাতির দাঁতের মতো। তার মাথার চুলে কালো সাপের মতো বিনুনি। সেই বিনুনি-বাঁধা চুল এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে, বুকে আর পিঠে পড়ছে ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে। নীল সমুদ্রের মতো মাঝে-মাঝে ফুলে-ফুলে উঠছে তার নীল ঘাঘরা। তার ঘুঙুরের শব্দে এই রাত্রির, এই সভা ঘরের, এই প্রাসাদের বুকে নেশা ধরেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হোলো হঠাৎ যেন ইতিহাসের হাজার-হাজার পাতা গেছে উল্টে আর মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক মোগল-বাদশার রাজ-সভায়।...

আমাদের কেউ যেন দেখেও দেখলো না। সেই বৃদ্ধ সোনার থালা থেকে এক মুঠো মোহর নর্তকীর পায়ে দিলো ছড়িয়ে। তারপর আতরদানি থেকে আতরের পাত্র তুলে নিজের দাড়িতে মাখালো। সমস্ত বাতাস সুগন্ধে ভারি হয়ে গেলো আর আমি স্পষ্ট দেখলুম মেয়েটি ঢেউ-এর ভঙ্গীতে

একটি ফুলের স্তূপের মতো ভেঙে পড়ে বৃদ্ধকে অভিবাদন করলো। কিন্তু তার আগে মির্জার দিকে তার ভ্রমরের মতো দুটি চোখ তুলে মুহূর্তের জন্য হাসলো। অপূর্ব সেই হাসি। সেই মৃদু-চকিত হাসির কোনো বর্ণনা নেই!

মির্জা ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর ইঙ্গিতে ডাকলো আমাকে। বৃদ্ধ আমার দিকে তার নীলার মতো উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো। আমার বুকের ভিতরটা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে উঠলো ধ্বক্-ধ্বক্ করে। ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে এলুম। কুর্নিশ করতে জানি না। কিন্তু কিছু একটা করা উচিত। নীচু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। আর সেই মুহূর্তে চারিদিক যেন তোলপাড় হয়ে গেলো। ঝনঝন করে যেন ভেঙে গেলো হাজার-হাজার কাঁচের আয়না। একটার পর একটা ঝাড়লণ্ঠন গেলো নিভে। আর আশ্চর্য, হাত আমি সরাতে পারলুম না। দেখলুম যার পায়ে হাত দিয়েছি সেই বৃদ্ধ মানুষ নয়, শ্বেত পাথরে খোদাই-করা এক মূর্তি। সজীব ছিলো এতক্ষণ। কিন্তু আমার স্পর্শে পলকের মধ্যে যেন তার সর্বাঙ্গ জমে পাথর হয়ে গেছে! তার নীলার মতো চোখের দৃষ্টি থেকে তার মুখের ধূর্ত হাসিটি পর্যন্ত এই মর্মর-মূর্তির উপর পড়েছে ধরা।...

ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হোলো সেই সভা, সেই প্রাসাদ, সেই প্রহরীরা। দেখলুম বিরাট ধূ-ধূ এক দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের

মাঝে মধ্য রাত্রে আমি আর মির্জা আর একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি! আর একটি অদৃশ্য মেয়ের ঘুরেবেড়ানো! কখনো-কখনো তার রেশমী ঘাঘরার সামান্য আভাস, কখনো তার ঘুঙুরের মৃদু ধ্বনি, কখনো শুধু সেই আশ্চর্য হাসি অন্ধকার রাত্রির বুকে।···আকাশে হু-হু করে মেঘের পর মেঘ উড়ে যাচ্ছে আর অন্ধকার গাছে-গাছে বাজছে বাতাসের শিস। আর আমি নতজানু হয়ে সেই মর্মরমূর্তির পায়ের আঙুল স্পর্শ করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি। সমস্ত শরীর শিউরে-শিউরে উঠছে। কিন্তু ভয় নেই।

মির্জা বললো, "ওঠো বন্ধু। ···এই আমার দাদামশাই। আর যে-মেয়েটি নাচছিলো—যাকে এখন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—সে-ই আমার স্ত্রী।···ও একদিন আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলো। আমি তাই সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে লুকিয়ে এক রাত্রে ওকে বিয়ে করেছিলুম। সেই রাতটাও ছিলো এই রকমই এক ঝড়ের রাত। সেই রাতেও বারোটায় চাঁদ ওঠবার কথা ছিলো।···কিন্তু সে-চাঁদ ওঠেনি। না আমাদের জীবনে, না নীল আকাশকে আরো নীল করে।...আমার দাদামশাই ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তাঁর ওই নীলার মতো নীল চোখে ধূলো দোবো এমন ক্ষমতা কোথায়? আমরা আর সূর্যের আলো দেখতে পেলুম না।···কিন্তু বড় শখ ছিলো তাঁর একটি মূর্তি গড়বো: শাদা পাথর কেটে অমর করবো

আমার দাদামশাইকে। আর সেই সঙ্গে অমর হবে আমার নাম।...আমার আজ পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু আমার সেই কামনার, সেই আন্তরিক ইচ্ছের মৃত্যু এখনো হয়নি। তারা ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, বার-বার ফিরে-ফিরে আসে।...তাই, বন্ধু, তোমাকে আজ দেখাতে এনেছিলুম আমার সেই মর্মর-স্বপ্ন।...তোমার জন্যে গাড়ি ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। ঠিক জায়গায় তোমাকে নামিয়ে দেবে।..."

মন্ত্র চালিতের মতো আমি সেই শাদা ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে উঠলুম। ঘোড়ার খুরে-খুরে জ্বলে উঠলো স্ফুলিঙ্গ : সোনালি আর নীল আর সবুজ। আর সেই শীতের রাতের ঝোড়ো অন্ধকারের বুকে আমি স্পষ্ট দেখলুম দুটি ভ্রমর-কালো চোখ আর বর্ণনাহীন হাসি! খুটখুট করে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ। অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাত। গাড়িতে একা। সমস্ত শরীর ভারি হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে আবার সুরু হয়েছে সেই যন্ত্রণা আর ঘুমে ভেঙে পড়ছে সমস্ত শরীর। কপালে একবার হাত দিয়ে দেখলুম যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো দেখি আগ্রা ইস্টিশানের ওয়েটিংরুমে শুয়ে আছি। জ্বর নেই। সমস্ত শরীর দুর্বল আর হালকা। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ। আকাশে ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নও নেই। কনকনে ঠাণ্ডা আর উজ্জ্বল উষ্ণ সোনালি সূর্য।

তাজমহল দেখবার কোনো উৎসাহ বোধ করলুম না। পরের ট্রেন ধরে সোজা চলে এলুম কলকাতায়।

আমার আশ্চর্য কাহিনী কেউই বিশ্বাস করলো না, বলাই বাহুল্য। আমার এক ডাক্তার-বন্ধু বললেন, "একটা ছোট্ট মশা তোমাকে নিশ্চয়ই কামড়েছিলো। ফলে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঘোরে একটা মস্ত আজগুবি কাণ্ড স্বপ্ন দেখেছো।" তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। জোর করে রক্ত পরীক্ষা করলেন। কী পেলেন তিনি আর ভগবানই জানেন। কিন্তু মাসখানেক ধরে সপ্তাহে দুটো করে কুইনাইনের বড়-বড় ইঞ্জেকশন আমাকে দেবেন বলেছেন!

শ্যাওলা

কেরোসিনের লণ্ঠনে লালচে আলো। সেই লালচে আলোয় অশোকার ফরসা দু'টি পায়ের পাতা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো, ফরসা আর নিটোল। একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তাদের তলায় অভয়ার দরিদ্র বাড়ির সবুজ শ্যাওলা।

অশোকা নিচু হয়ে খামটা তুলে নিলো। কাঁধের উপর থেকে মুর্শিদাবাদ সিল্কের ছাপা-শাড়ির আঁচলটা অপরিষ্কার উঠোনের উপর খসে পড়লো। দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়ি আসায় রয়েল মেলের বাতাসে তার যে-চুলগুলি বিস্রস্ত হয়ে পড়েছিলো সেগুলি মুহূর্তের জন্য ঢেকে দিলো তার ফরসা মুখ। তারপর অস্বাভাবিক হেসে অশোকা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। উঠোনে লণ্ঠনটা নামানো। তার লালচে আলো সবুজ শ্যাওলায়, সিল্কের শাড়িতে আর তার পায়ের ফরসা পাতায় শুধু পড়েছে। মুখটা অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকা। ভালো করে বোঝা যায় না তার একটি দাঁত একটু উঁচু বলে বাঁ-দিকের ঠোঁটটা সামান্য ফুলে আছে।

দার্জিলিঙের মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি করে দেখতে-দেখতে তার ছ'টা বছর কেটে গেছে। প্রথমে এম. এ. তার পর বি-টি।

তার পর এই ছ'বছরের মাস্টারি। খামটা কুড়িয়ে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে বিদ্যুতের মতো স্মৃতির ঢেউ খেলে গেলো। তারপর আবার অস্পষ্ট হাসলো। তার হাসবার বিশেষ একটি ভঙ্গী আছে। ডান গালে টোল পড়ে, উঁচু-দাঁতটা সামান্য দেখা যায়, ডান দিকের দু'টি ঠোঁট যেখানে মিশেছে সেখানটা এমন আশ্চর্য রকম কুঁকড়ে উঠে কয়েকটি রেখার সৃষ্টি করে যা দেখলে মন বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না। মনে হয়, ঠিক এই মুখটির জন্য আজীবন বুঝি অপেক্ষা করা যায়, সাহারার সূর্যদগ্ধ বালির উপর বুঝি হাঁটা যায় দিনের পর দিন।

এই শেষের কথাগুলি অবশ্য অন্য কারুর নয়—দিনেশের কথা। দিনেশ ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি. এস্-সি পড়তো। একবার তারা শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে সূর্যাস্ত-রঙীন প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঐ কথাগুলি অশোকাকে সে বলেছিলো। জীবনে কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটে—কত অনর্থক ঘুম-না-আসা জেগে-থাকা রাত, কত অকারণ খুসি-হওয়া, ভালো-লাগা, মন-কেমন-করা। জীবনের শ্লেটে এক দিন তারা লেখা হয়, আবার মুছে যায় এক দিন। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনার চেয়ে মাঝে-মাঝে এই সব তুচ্ছ কথা হঠাৎ মনে পড়ে অশোকাকে চমকে দেয়। সে সব ভুলেছে; শুধু দিনেশের ঐ কথাগুলি নানান অসময়ে মনে পড়ে তাকে বিব্রত করে তোলে।

যে-খামটা অশোকা তুলে নিলো সেই-দিনেশের এক

অপ্রত্যাশিত চিঠি তার মধ্যে। তাই সবুজ শ্যাওলা আর লণ্ঠনের লালচে আলোয় তার মনে মরুভূমির ছবিটা আবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আর সে-কারণেই হাসলো অশোকা। অন্ধকারে তার হাসিটি অস্পষ্ট।

দিনেশ ডাকলেই আসতে হবে—অশোকার জীবনে এই সাধারণ নিয়ম। তাই দিনেশের চিঠি পাবার পর কিছু না-ভেবেই একটি স্যুটকেশ গুছিয়ে, ইস্কুলে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সে রয়েল মেলে চড়ে বসেছিলো। তারপর গাড়ি যত ছুটতে লাগলো, বৃষ্টি-ভেজা কনকনে পাহাড়ি বাতাস সমতল মাটির দিকে ক্রমশ যত গরম হয়ে উঠতে লাগলো, ততই একটি অস্বস্তিতে তার সমস্ত মন যেন অসুস্থ হয়ে উঠলো। সেই খামটাকে হাত-ব্যাগের মধ্যে ভরতে পর্যন্ত সে ভুলেছে। সকাল থেকে তার হাতে-হাতেই ঘুরছে খামটা।

অভয়া বললো, "অশোকাদি, তোমার ট্রেনের এখনো পোনে দু'ঘণ্টা দেরি। ইচ্ছে করলে স্নান সেরে অনায়াসে একটু গড়িয়ে নিতে পারো। ঠিক সময়ে আমি তুলে দেবো।"

অশোকার চোখ-মুখ জ্বালা করছিলো। শিলিগুড়ির ভাদ্র মাসের গুমোটে সম্ভবত নিজের শরীরটাকে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। বললো, "শোবার দরকার নেই ভাই। মুখে-চোখে একটু জল ছিটোলেই হবে।" তারপর স্নানের ঘরের পরিচিত অন্ধকারের দিকে সে এগিয়ে গেলো।

অভয়াদের এই দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অপরিষ্কার বাড়িটার মধ্যে স্নানের ঘরের এই অন্ধকারটুকু তার ভালো লাগে। ইচ্ছে করেই লণ্ঠনটাকে ভিতরে সে আনে না। এই ছোট্ট ঘরের সব-কিছুই তার জানা। সামনেই চৌবাচ্চা, কোণে মগ, ডান দিকের দেয়ালে কাঠের শেলফের উপর সাবানদানি। খবর না দিয়ে আসায় অভয়া আজ নতুন সাবান রাখেনি। দরজাটা ভেজিয়ে চোখ বুজে খানিক সে দাঁড়িয়ে রইলো। সাবানে আজ আর দরকার নেই। এই ঘন অন্ধকারকে দার্জিলিঙের কুয়াশার মতো ঠাণ্ডা করে আঁজলা ভরে সে যদি মুখে মাখতে পারতো, যদি পারতো স্নান করতে! অভয়ার কোলের মেয়েটি শোবার ঘরে কাঁদছে। অভয়া বোধ হয় লুচি ভাজতে ব্যস্ত। খাবারের কথা ভাবতেই তার শরীরের ভিতরটা যেন পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠলো।

চোখে-মুখে জল না দিয়েই সে বেরিয়ে এলো। শিশুর কান্না তার সহ্য হয় না। খামটা ব্লাউজের মধ্যে ফেলে অভয়াদের শোবার ঘরে গেলো অশোকা। বাচ্চাটার কী সুন্দর ঝুমকো-ঝুমকো চুল হয়েছে! আহা বেচারা, কত ক্ষিদেই না-জানি পেয়েছে। তাকে নিজের বুকের উপর চেপে ধরতেই ব্লাউজের ভিতরকার খামটা খড়-খড় করে উঠলো। শিউরে উঠলো অশোকা। এই বাচ্চাটাকে বুকে পিষে সে ভাবলো, এবারে অনায়াসে মরতে পারে।—তারপর সেই শাল-কাঠের তক্তার

এক কোণে ঝুপ করে বসে লুচি ভাজার শব্দ শুনতে লাগলো।

গরমে রীতিমতো যেন হাঁপ ধরে যায়। কাণের পাশ দিয়ে গালের উপর যে-ক'টি চুল এসে পড়েছে তার নীচে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। অভয়ার মেয়েটা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো। অতি সন্তর্পণে তাকে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে পাশের হাতপাখাটা তুলে নিলো অশোকা। বাচ্চাকে খানিক বাতাস করলো, তারপর ভালো করে ভাবতে চেষ্টা করলো দিনেশের সঙ্গে কবে তার প্রথম পরিচয়।

এত দিন পরে সেই প্রথম-দিনটিকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। সিনেমায়, না কলেজের করিডোরে, না ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট ম্যাচে, না বাসে, না ট্রামে?—কোথায়? তারপরেই নতুন চকচকে টাকার মতো ঘটনাটা ঝক-ঝক করে উঠলো। এতো দিন পরেও লজ্জায় তার কাণের গোড়াটা পর্যন্ত উঠলো লাল হয়ে। স্পষ্ট মনে পড়ছে—প্রথম আলাপ এসপ্লানেড থেকে কলেজ স্ট্রিটের ট্রামে।

তার আগে দিনেশকে সে যে চিনতো না এ-কথাটা ঠিক নয়। স্কটিশের ছাত্রীদের মধ্যে কে তখন দিনেশকে না চেনে? ছিপছিপে চেহারা, মাথায় বড়-বড় ঈষৎ বাদামি রঙের চুল—বাদামির চেয়ে সোনালির আভাটাই বেশি, নিতান্ত ছেলেমানুষ, ভালো করে দাড়ি পর্যন্ত গজায়নি, টিকলো নাক, আর প্রায়

সমস্ত মুখ-জোড়া কুচকুচে কালো শেলের চশমা। থার্ড ইয়ারের অনেকে তখন সিগারেট ধরেছে কিন্তু দিনেশের ঠোঁটে সর্বদাই একটা মোটা চুরুট। এমন বেমানান লাগতো—অথচ তার মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরানোও শক্ত। তাকে প্রথম দেখলে অতিশয় মুখচোরা বলে মনে হোতো। কিন্তু কথা শুনলে সে-ভুল ভাঙতো। তার বাচালতার শেষ ছিলো না। আই. এস্-সি-তে প্রথম হয়ে, নিখিল ভারত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের বড় কাপ এবং আলোকচিত্র এগজিবিশনের সোনার মেডেল পেয়ে দিনেশ তখন কলেজ এবং সংবাদপত্রের প্রথম খবর। এ-রকম সহপাঠীর দিকে কোন মেয়ে তখন লুকিয়ে চায়নি, গোপনে পূজো করেনি? তখন কোনো ছাত্রই মোটর হাঁকিয়ে আসতো না—শুধু দিনেশ ছাড়া। যা-কিছু সাধারণ তার প্রত্যেকটিরই ব্যতিক্রম ছিলো দিনেশ। গুজব শোনা যেতো, তার বিধবা পিসী নিজের কয়েক লক্ষ মজুত টাকার সবটাই দিনেশকে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দিনেশের পিতাও তখন ব্যারিস্টার-মহলের দু'নম্বর এবং গুজব তাঁরও মাসিক আয় পনেরো থেকে বিশ হাজারের মধ্যে। লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর বরপুত্রের কথাটা গল্পেই শোনা যায়। কিন্তু দিনেশ তখন ছিলো তার একমাত্র দৃষ্টান্ত। সে এমন একটা ভাব করে হাঁটতো, সিগার টানতো, প্রফেসরদের লেকচার শুনে হাসতো যা দেখলে সবাইকার মনে গভীর সমীহ, স্পষ্ট

প্রশংসা এবং গোপন ঈর্ষার উদ্রেক না হয়ে উপায় ছিলো না।

নিজের চেয়ে কয়েক বছরের ছোটো এই দিনেশ ছেলেটিকে কলেজে দেখে অশোকার মনে প্রথমে কিন্তু ঈর্ষা কিংবা সমীহের ভাব জাগেনি।—কেবল অস্পষ্ট একটা ভয় সাপের মতো যেন তাকে আলিঙ্গন করেছিলো। মসৃণ পাথর হাতড়ে উপরে ওঠার চেষ্টা এবং প্রতি মুহূর্তে হাত ফস্কে গভীর খাদে তলিয়ে যাবার ভয়!—কী আশ্চর্য সঠিক ভাবে দিনেশকে প্রথম সে চিনেছিলো!

কিন্তু মৌখিক আলাপ তখনো হয়নি। আড়চোখে দিনেশকে কতবার সে দেখেছে আর চোখে চোখ পড়তেই কতবার তার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে তার হিসেব নেই।

থার্ড ইয়ারে তার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে অবশ্যই আরো দু'জন ছিলো। কিন্তু তাদের সৌন্দর্য মাংসল—অন্তত দিনেশ তাই বলতো। বলতো : তারা মৌশুমি ফুলের মতো—অকস্মাৎ সমস্ত পাপড়ি মেলে বিভ্রম জাগায়, তারপর যখন ঝরে যায় তাদের শুকনো ডাঁটা ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু অশোকা যেন রজনীগন্ধার গুচ্ছ—একটি ফুল ঝরে তো নতুন একটি শ্বেত-পাপড়ি বিকশিত হয়। রজনীগন্ধার সঙ্গে শুধু তার পার্থক্য এই—তাদের কুঁড়ির শেষ আছে, অশোকার নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ফুল ফোটাবে। প্রতিদিন নতুন চমক আনবে, প্রতিদিন নতুন হয়ে জন্মাবে। বয়সে বড় হলেও

দিনেশের কথায় সেদিন বাস্তবিক অশোকা ভুলেছিলো! এত-বড় বোকামি কী করে কেউ করে?

কলেজে অনেক বার দিনেশের চোখে তার চোখ পড়েছে। সেই মোটা কালো ফ্রেমের পিছনে তার দু'টি চোখ যেন চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর পলক পড়বার আগেই অশোকা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি কি জানি কেন অশোকার ভালো লাগেনি। কেবলি মনে হয়েছে সে যেন বড় বেশি দেখতে পায়। যেন অশ্লীল রকম বেশি দেখে। তার দৃষ্টির সামনে যেন শালীনতা বজায় রাখা যায় না। তবু, কী যেন ছিলো তার সেই কালো ফ্রেমের পিছনে ঈষৎ-কটা চোখের তারায়। বার-বার তারা যেন আকর্ষণ করে, যেন নেশা লাগায়।

অনেক আগেই কলেজে দিনেশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটতে পারতো, কিন্তু নিজেই সে সন্তর্পণে তার ছায়া এড়িয়ে গেছে। অনেকবার লোভ হয়েছে, আর যখনই লোভ হয়েছে তখনই নিজেকে চোখ রাঙিয়েছে সে। তার এই এড়িয়ে-যাওয়া দিনেশকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। তাই আলাপ করবার জন্য তারও রোখ চেপে গেলো!

ব্যাপারটা অশোকা কিছু দিন পরেই আঁচ করলো। সে লক্ষ্য করলো, মোটর ছেড়ে দিনেশ বাসে-ট্রামে ঘুরছে আর প্রায়ই অশোকা যে-বাসে কিংবা ট্রামে থাকে তার পা-দানিতে

লাফ দিয়ে উঠছে। সেদিন এস্প্লানেডের ট্রাম বদল করে কলেজ স্ট্রিটের ট্রামে উঠেই সে দেখলো পিছনে দিনেশ। তার মুখের সিগারটা অশোকার কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়েছে। দেখেই তার সমস্ত শরীর রাগে জ্বালা করে উঠলো। ট্রামে বেজায় ভীড়, সামনে এগুনো যায় না। মেয়েদের বসবার জায়গাও খালি নেই। একটি যুবক উঠে তাকে বসতে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলো। রুক্ষ স্বরে অশোকা তাকে বললো, "ধন্যবাদ! আমি অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেতে পারবো।"

তারপরেই দিনেশের দিকে ফিরে বললো, "দয়া করে আপনার সিগারটা সরাবেন? আমার গায়ে ছাই পড়ছে।"

ট্রামের সব ক'টি চোখ দিনেশের সিগারে এসে নিবদ্ধ হোলো! অনেক যুবক উসখুস করে উঠেছিলো দিনেশকে দু'চার ঘা দিয়ে রীতিমতো শিক্ষা দেবার জন্য। নির্বিকার ভাবে জানালা গলিয়ে চুরুটটা ছুঁড়ে দিনেশ বললো, "দুঃখিত।" তারপর উপরের হাতলটা ধরে সে যেন অশোকার আরো কাছে ঝুঁকে পড়লো।

উত্তেজিত গলায় অশোকা এবার প্রায় চীৎকার করে উঠলো, "দয়া করে একটু সরে দাঁড়াবেন? আপনি বারবার আমার ঘাড়ে এসে পড়ছেন। বলাই বাহুল্য, আমি খুব পছন্দ করছি না।"

কয়েকটি উত্তেজিত থমথমে মুহূর্ত। ট্রামের যাত্রীরা এবার বুঝি দিনেশকে গুঁড়িয়ে ফেলে।

কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে মধুর হেসে দিনেশ উত্তর দিলো, "নিশ্চয়ই সরবো। কিন্তু তার আগে আমার পায়ের ওপর থেকে নেমে দাঁড়ালে আমার পক্ষে সরে দাঁড়ানোটা বোধ করি সহজ হয়।"

চমকে অশোকা চাইলো তার পায়ের দিকে। যারা কাছে ছিলো তাদেরও কৌতূহলী দৃষ্টি অশোকার পায়ের উপর থামলো। ভেলভেটের নাগরায় তার ফরসা পা আরো ফরসা দেখাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে সেই একটি নাগরা দিয়ে কখন সে যে দিনেশের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে নিজেই টের পায়নি।

সেই গুমট আবহাওয়া যাত্রীদের সমবেত হাসিতে মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেলো। আর অশোকার যে কী হোলো সে জানে না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে সুরু করেছে।...তারপরের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। ঘন্টা বাজিয়ে ট্রাম থামিয়ে তার হাত ধরে নামিয়ে নিলো দিনেশ, পাশের খালি ট্যাক্সিটায় তাকে তুলে নিমেষের মধ্যে সেই হাজার চোখের দৃষ্টির বাইরে যেন যাদুমন্ত্রে এনে ফেললো। তার কী হয়েছিলো কে বলবে? যেন ভূতে পেয়েছিলো। সমস্ত শরীরটা কান্না হয়ে গলে গেলে সে বুঝি বেঁচে যেতো। ও-রকম কান্না জীবনে কোনো দিন সে কাঁদেনি। যেন কঠিন বাঁধ ভেঙে একটা উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত বন্যা তাকে নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। নিজেই সেকি দিনেশের বুকে আশ্রয়

নিয়েছিলো, না দিনেশ তাকে টেনে নিয়েছিলো ? তার আঙুল-গুলি কী অপরূপ নরম, লম্বা আর ফরসা। যেন পুরুষের আঙুল নয়। সেই আঙুল দিয়ে অশোকার মাথায় আর কপালে সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো আর ফিসফিস করে বলছিলো—ঠিক কী বলছিলো মনে নেই। ট্যাক্সি গিয়ে থামলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। শুধু দিনেশই ও-রকম দিনে ডাকাতি করতে পারে।

তারপর কোথা দিয়ে হু-হু করে সময় কেটেছে—সিনেমার ফিকে অন্ধকারে, বিলিতি রেস্তরাঁর অর্কেস্ট্রায়, আউট্রাম ঘাটের দোতলায় চায়ের পেয়ালা নিয়ে, শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে, নিউ মার্কেটের আইসক্রিম কেবিনে, ডায়মণ্ড হারবারের দুরন্ত বাতাসে, দিনেশের টু-সিটারে। যেন ঝড়ে তারা উড়ে বেড়িয়েছে। ঝড় এসেছিলো, এমন ঝড় তারা কল্পনা করতেও পারেনি। কত কথা, কত ছবি, কত ঘটনা মনে পড়ছে: গড়ের মাঠের চোরকাঁটা, গঙ্গায় রাত্রির ঝলোমলো জাহাজ, নৌকোর দোলা, রেড রোডে ঘণ্টায় সত্তর মাইল, চৌরঙ্গির আলো, রাতের কলকাতা, পার্ক স্ট্রিটের নির্জন ফ্ল্যাট, জানালার ভিতর দিয়ে দেখা শরতের নীল আকাশ, শাদা মেঘ, সেই মধুর আলস্য, দিনেশের অদ্ভুত চোখ, সোনালি চুল, আশ্চর্য আঙুল! কী করছে কখনো ভেবে দেখবার সময় হয়নি। অত ভালো-লাগা, অত ভালোবাসা এক-এক সময় সে যেন সহ্য করতে

পারতো না। যেন মরতে পারলে বাঁচতো। কেন সে মরেনি, কেন মরতে সে পারেনি ?

খুব জোরে ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ ব্রেক কসলে যে রকম ঝাকুনি, লাগে সেই সকালের সেই-অনুভূতিটাও সে-রকম। ও-রকম ভয় জীবনে সে পায়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে-বিবর্ণ সেই-অশোকার চেহারাও আজ সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সেই দু'টি থরথর করে কাঁপা বিবর্ণ ঠোঁটের কথা ভোলা সম্ভব নয়।

খবর শুনে দিনেশও প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলো তারপর জোর করে সে যে সাহস দেখাতে চেষ্টা করেছিলো অশোকাকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি।

"আমি সমস্ত ম্যানেজ করে দেবো। কিন্তু তোমার ভুল হয়নি তো ?"

না, অশোকার ভুল হয়নি। কিছু দিন ধরেই তার সন্দেহ হচ্ছিলো। সেদিন সকালে বাথরুমে লুকিয়ে বমি করতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়েছিলো।

"কী হবে দিনেশ ?" ভারি ভীরু-গলায় সে প্রশ্ন করলো।

"কী আর হবে, কিছুই হবে না! আমি সমস্ত ম্যানেজ করে দিচ্ছি।"

বিকেলে দিনেশ খবর আনলো। যতটা সহজে সব ঠিক করে ফেলবে ভেবেছিলো তার মুখ দেখেই বোঝা গেলো ততটা

সহজ হয়নি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে একটা ঘাসের শিস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটতে-কাটতে দিনেশ খানিক চুপ করে রইলো। শেষে বললো, "ডাঃ বার্ণার্ডকে বহু কষ্টে রাজি করিয়েছি। সে দশ হাজার চায়। বলছে রিস্ক ভয়ানক। কোনো রকমে জানাজানি হলে তার সমস্ত পসার মাটি, তার ওপর হাতে হাত-কড়া তো পড়বেই।—ওসব বাজে কথা। আসলে আমাকে চেনে। জানে অনেক টাকা আছে। তাই মুচড়ে যা আদায় করতে পারে।—কিন্তু দশ হাজার তো আমার কাছে নেই। বাবার কাছে চাইতে হবে। কী বলে চাইবো ?"

"দিনেশ," তার হাতের উপর হাত রেখে অশোকা বললো, "দিনেশ, তার চেয়ে আমাদের বিয়ে হোক।"

সাপে কামড়ানো মানুষের মতো দিনেশ বললো, "বিয়ে ? পাগল ? বাবা এক্ষুনি ডিসইনহেরিট করবেন।" পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললো, "বিয়ে তো হবেই।—কিন্তু বিলেত থেকে আগে ঘুরে আসি। ততদিনে মেজর হয়ে যাবো। পিসিমার সমস্ত টাকা তখন আমার হাতে এসে পড়বে।"

তখনই অশোকা যেন আশ্চর্য উপায়ে তার ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়েছিলো। ঘাসের উপর থেকে চোখ তুলতে পারেনি। শুধু মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলো, "আমাকে কী-কী করতে হবে বলো।"

"আমাদের ফ্ল্যাটে অপারেশন হবে না। ভালো নার্সিং-হোমে যেতে হবে। বার্ণার্ডের চেনা সে-রকম একটা নার্সিং-হোম আছে। সেখানে শুধুই ইংরেজ থাকে, অতএব জানাজানি হবার কোনো ভয় নেই। পরশু সকালে আমরা মিট করবো। তারপরের দিন অপারেশন।"

"ক'দিন থাকতে হবে?"

"দিন সাতেক।"

"সা-ত-দি-ন! বাড়িতে কী বলবো?"

"বোলো রাঁচিতে তোমার এক বান্ধবীর বাড়ি ক্লাসের মেয়েরা দল বেঁধে আউটিঙে যাচ্ছে, তুমিও যাবে।—রিস্ক একটু নিতেই হবে।"

"বেশ, তাই হবে।"

"শুধু এখন টাকাটার ভাবনা। শেষ পর্যন্ত মার গয়নার সিন্ধুক ভাঙবো না কি বাবার চেক জাল করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"দিনেশ, দিনেশ..." অশোকা আর্তনাদ করে উঠলো।

হেসে উত্তর দিলো দিনেশ, "ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কী করে টাকার জোগাড় হোলো তুমি জনেতেও পারবে না কোনো দিন।"

বাস্তবিক, আজ পর্যন্ত অশোকা সে-খবর জানেনি।

পরের দিন দেখা হয়নি। তার পরের দিন সকালে হাতে

স্যুটকেশ নিয়ে এসপ্লানেডে অশোকা নামলো। গাড়ি নিয়ে দিনেশ হাজির ছিলো। বুকটা ঢিব-ঢিব করছে, যদিও গত দু'দিন তার ক্রমাগত মনে হয়েছে তার বুকের ভিতরে চির-কালের জন্য কী যেন মরে গেছে। —তারপর বালিগঞ্জের সেই নির্জন নার্সিং-হোমের নিস্তব্ধ লাল বাড়ি, সেই দীর্ঘ-দীর্ঘ দেবদারু, স্টিলের ইনভ্যালিড খাট, বিছানার শাদা চাদর, শাদা দেয়াল, এক ফালি নীল আকাশ। অপারেশানের আগে দিনেশ বললো, "ভয় করছে তোমার?" মুখ ফুটে সে বলতে পারেনি, "হ্যাঁ করছে,—যদি বেঁচে উঠি!" ক্লোরফর্মের মাস্ক মুখে নিয়ে ইংরিজিতে এক-দুই গুণতে-গুণতে অশোকার বাস্তবিক বেঁচে-ওঠার ভয় করেছিলো!

সত্যিই সে বেঁচে উঠলো। সাত দিন পরে যখন বাড়ি ফিরলো তখন চোখের কোল বসে গেছে, হাঁটতে গেলে হাঁটু ভেঙে যায়, বুকটা ধ্বকধ্বক করে—তবু বেঁচে সে উঠলো। কাকিমার নানা উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে কেবলি তার মনে হচ্ছিলো একটি শিশুর জীবনের বিনিময়ে সে প্রাণ পেয়েছে। এ-প্রাণের মানে কী?

পরীক্ষা আসন্ন। টেস্টের পর কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। সম্ভবত নিজের প্রথম নাম বজায় রাখার জন্যই দিনেশের বিশেষ দেখা মেলে না। পরীক্ষার আগের সেই তিনটি মাস তার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়···শীত শেষ হয়েছে, কলকাতার

গাছে-গাছে পুরনো পাতার পর নতুন পাতা দেখা দিয়েছে, ঝড়ের মতো দক্ষিণের বাতাস বইলো, একদিন কালবৈশাখীও হয়ে গেলো। তারপর পরীক্ষা। পরীক্ষাও শেষ হোলো। তারপর নিস্তব্ধ দুপুর। গরম বাতাস যেন তার বুকের সমস্ত রস শুষে নিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু দিনেশের দেখা নেই। সে তখন পরীক্ষা শেষের ছুটি ভোগ করতে শ্রীনগর।

তারপর মাত্র একবার দিনেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। প্র্যাকটিক্যালে ভালো না করলেও ফিজিক্সে সে প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছিলো। সে জানাতে এসেছিলো অক্সফোর্ডে জায়গা পেয়েছে। ভালো ছেলেদের কাম্য সিভিল সার্ভিসের জন্য দিনেশ বিলেত গেলো।

অশোকার মনের মধ্যে তখন কী করে সেই পরিবর্তন এসেছিলো? আনন্দ কিংবা বেদনা—কোনো রকম বোধশক্তিই নেই। কেবল মাথার মধ্যে ঘুরছে মধ্যবিত্ত কাকার সংসারে আর সে ভারগ্রস্ত হয়ে থাকবে না। যেমন করেই হোক নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে। পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। কোনো রকমে পাস করেছে মাত্র। দুটি ট্যুশানি নিয়ে এম-এ ক্লাসে সে ভর্তি হোলো। যাবার আগে সম্ভবত ভদ্রতা করেই দিনেশ তাকে বলেছিলো অপেক্ষা করতে! কিন্তু নিঃসন্দেহে অশোকা তখন জেনে গেছে, দিনেশের কাছে তার আর কোনো চমক নেই। তার জীবনের রজনীগন্ধার সব কুঁড়িগুলিই ফুটে

গেছে। তার সেই টোল-খাওয়া গালের হাসির জন্য আর যে-ই পারুক অন্তত দিনেশ সাহারার সূর্যদগ্ধ বালির উপর অনির্দিষ্ট কাল ধরে কখনও হেঁটে বেড়াতে পারবে না।

সমস্তই অভ্যেস হয়ে যায়। কলেজের পড়া, দৈনিক ট্যুশানি, সংসারের টানাটানি, দিনেশের অভাব—ধীরে-ধীরে সমস্তই সহ্য হয়ে এলো। প্রথমে এম্. এ. তার পর বি-টি পাশ করলো। প্রথম-প্রথম দিনেশের চিঠি আসতো। তারপর কমতে-কমতে এক দিন তা-ও বন্ধ হোলো। মাঝে-মাঝে নানা অপ্রত্যাশিত দিক থেকে দিনেশের খবর সে পেয়েছে। সিভিল সার্ভিস ভাগ্যে জোটেনি, ডক্টরেটের জন্য কয়েক বছর চেষ্টা করার পর তার আশাও সে ছেড়েছে। দু' বছর আগে দার্জিলিঙে চাকরি নিয়ে চলে আসার সময় অশোকা শুনেছিলো, দিনেশ ওখানে জার্নালিজম্-এর চেষ্টা করছে। তার পর দার্জিলিঙেই সে শুনলো, দিনেশ না কি ঠিক করেছে ভারতবর্ষে আর ফিরবেই না। এ-দেশে প্রাণ নেই, জীবনের মানে নেই। বিলেতে বসে পৈতৃক অর্থে রেসের মাঠ, নাইট ক্লাব,বার ইত্যাদিতে ডুব দিয়ে দিনেশ আসল প্রাণ এবং জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। নারী-সংক্রান্ত কয়েকটি কেলেঙ্কারির খবরও অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এসেছে।

বছর খানেক আগে হাইকোর্টে বিপক্ষ পক্ষের সাক্ষীকে জেরা করার সময় অকস্মাৎ দিনেশের পিতার থ্রম্বসিসের স্ট্রোকে

মৃত্যু হয়। তিনি বিপত্নীক এবং সংসারের মধ্যে ঐ দিনেশ ছাড়া আর কেউ নেই। কিছু দিনের মধ্যেই কাগজে এবং গুজবে অশোকা আরো নানা খবর পেলো। দিনেশের বাবা দেউলিয়া হয়ে মারা যান, পাওনাদাররা আড়াই লাখে স্টোর রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িটা বিক্রি করেছে। শোনা গেলো, শেয়ার বাজারের বড়-বড় বাজি তিনি ধরতেন। শেষের ক'বছর তাঁর সমস্ত হিসেব ভুল হয়েছিলো! নিজের সমস্ত উপার্জনের টাকা শেয়ার বাজারের বিরাট গহ্বরে তলিয়েছে। অশোকা তখনো জানে পিসিমার টাকাটা দিনেশের জন্য মজুত আছে।

কিন্তু আজ সকালের চিঠিটা বাস্তবিক অবাক করেছে তাকে। এক বিলিতি টায়ার কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দিনেশ ফিরেছে। বেতনের যে-অঙ্কটা উল্লেখ করেছে তাতে সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের চলে, কিন্তু দিনেশের তা দশ দিনের খরচও নয়। দিনেশের চিঠিটা দীর্ঘ, তাতে অনেক খবর আছে। বিলেতে শেষ পর্যন্ত সে যে বিয়ে করেছিলো এবং ফেরবার আগে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়—এ-খবরটাও চাপেনি। তার পিসিমার টাকাটাও দিনেশের বাবা শেয়ার বাজারে ফেলে যে বড় রকমের একটা টাল সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে-খবরও দিনেশ জানিয়াছে। চিঠির শেষের অংশ সেন্টিমেণ্টাল এবং রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি ছত্র উদ্‌ধৃত করে সে লিখেছে :

সুদূরের পথ দিয়ে নিকটকে সে আজ লাভ করবে, আজ বাঁশি বাজবে না, রক্তাম্বর পরবে না কেউ, ইত্যাদি। আপাতত থিয়েটার রোডের এক ফ্ল্যাট সে ভাড়া নিয়েছে, অশোকার জন্য কাল সন্ধে সাতটায় সে অপেক্ষা করবে। অশোকা কি আসবে? নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করবে?

অভয়া জোর করে না-খাইয়ে ছাড়লো না। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। লণ্ঠনের আলোয় আবার সেই সবুজ শ্যাওলার উঠোনে অশোকা এসে দাঁড়ালো। তার বাল্যবন্ধু অভয়া। তার স্বামী এখানকার পার্সেল ক্লার্ক। তিনি অশোকার সুটকেশটা নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে। অভয়ার মেয়েটি তখন থেকে ঘুমুচ্ছে। কবে আবার অশোকা ফিরবে, ফেরবার আগে যেন তারা খবর পায়—এই সব কথা অভয়া বলছিলো।

তারপর অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোয় কাঁচা পথ ভেঙে, রেল-লাইন টপকে অভয়ার স্বামীর সঙ্গে ইস্টিশানে এসে পৌঁছলো অশোকা। নীচের বার্থ পাওয়া গেছে। বিশেষ ভীড় নেই।…সে কি ক্ষমা করতে পারবে? সে কি দেখা করবে থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে? …অভয়ার স্বামী হাত তুলে নমস্কার করলেন। ইষ্টিশানের আলো মিলিয়ে গেলো। ট্রেনের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ মিশেছে।…

…কাল সন্ধে সাতটায় হয়তো বৃষ্টি থেমেছে। কিছু আগে কলকাতার পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্ত হয়েছে। থিয়েটার রোডে

ট্রাম থেকে নামার পর হয়তো সেই আকাশ খানিকক্ষণ অশোকাকে উন্মনা করে দেবে। আকাশের সমস্ত রঙ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে। মেঘ-ছেঁড়া আকাশের তলার পৃথিবীতে সেই পরিচিত ঠাণ্ডা নীল আলো। প্যারামবুলেটারে বাচ্চাদের চাপিয়ে আয়ারা ফিরছে। ট্রাফিক পুলিশ হাত বাড়ালো। মোটরের স্রোত হঠাৎ থামলো। কী সুন্দর পিছনের লাল আলোগুলো। মনে হয়, দ্রুত ধাবমান লাল তারার ঝাঁক হঠাৎ থেমে গেছে। এই সুযোগে অশোকা কি রাস্তা পার হবে? তার সামনে হাতে হাত ঢুকিয়ে দু'টি ফিরিঙ্গী স্ত্রী-পুরুষ রাস্তা পার হচ্ছে। কিছু না-ভেবেই হয়তো অশোকাও রাস্তা পার হোলো। ...এই চারতলা বাড়িটার তিন তলার বেয়াল্লিশ নম্বরের ফ্ল্যাটে দিনেশ আছে। নানা খোলা জানালার ভিতর দিয়ে পাতলা রেশমি পরদা, রঙীন টেবিল ল্যাম্প এবং ঘুরন্ত ফ্যানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দূর থেকে সে কি খনিক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে? তারপর হয়তো অকস্মাৎ মনে হবে সমস্ত বাড়িটা তার আলোকিত গবাক্ষের অসংখ্য চক্ষু দিয়ে অশোকাকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে।... অশোকা আবার হাঁটতে আরম্ভ করেছে। বাঁ-দিকে সদর দরজা, সামনেই লিফ্‌ট। অশোকা বাঁয়ে বেঁকবে? লিফ্‌ট-এ উঠবে? না কি ধীরে-ধীরে বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে?

বৃষ্টি-ধরা আকাশের সেই নীলচে আলোয় কী যে হবে এখনো অশোকা জানে না।

তার জীবনের সবুজ শ্যাওলার তলায় সুস্থ মাটি সে কি সত্যিই খুঁজে পাবে?

—শেষ—

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পারুলদি ।